কাণ্ড বুদ্ধদেব ভিক্ষু-সঙ্ঘে প্রবিষ্ট হইতে দেন নাই। বিদ্যার আকর বলিয়া তাঁহার নিকট বেদের কোন মাহাত্ম্য ছিল না; তিনি নিজে প্রবুদ্ধ হইয়া যে মহাসত্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা বেদেরও অনধিগম্য, বেদবাক্য হইতেও উচ্চতর। সে সত্য বিশ্বজনীন, দেশবিশেষে অথবা জাতিবিশেষে বদ্ধ নহে। তিনি সেই সত্য, ব্রাহ্মণ শূদ্র, উচ্চ নীচ সকলেরই মধ্যে প্রচার করিতে ব্রতী হইলেন, তাঁহার সঙ্ঘের দ্বারও সকলেরই জন্য উন্মুক্ত হইল।

জাতিভেদ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মতামত সমালোচনা করিয়া, Rhys-Davids তাঁহার অম্বষ্ঠ সূত্রে (Dialogues of the Buddha গ্রন্থে) যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভূমিকার কিয়দংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।—

বুদ্ধের সময়ে জাতিভেদ প্রথা প্রথম গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ হয়। আমরা দেখিতে পাই, সেকালে জনসঙ্ঘ সাধারণতঃ চার ভাগে বিভক্ত ছিল। কিন্তু এই প্রভেদের সীমা সুস্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল না। এক প্রান্তে সমাজবহির্ভূত অস্পৃশ্য অনার্য্যগণ— অপর প্রান্তে ব্রাহ্মণবংশ-সম্ভূত জনপদ। এই ব্রাহ্মণগণের পৌরোহিত্য ব্যতীত অন্য ব্যবসায়ও ছিল। শৌচাশৌচের নিয়ম রক্ষা করিয়া সামাজিক বিধিসকল গঠিত হইয়াছিল। সভ্যতার সমান অবস্থায় এই একই বিধান অন্যান্য দেশেও প্রচলিত দেখা যায়। ব্রাহ্মণগণের আধিপত্যস্বরূপ ভারতের সমাজ-মণ্ডপের যে বিশিষ্ট স্তম্ভ, তখনও তাহার সুদৃঢ় স্থাপনা হয় নাই। অধুনা জাতিভেদ বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তখনও তাহার অস্তিত্ব ছিল

না। এই সামাজিক অবস্থার মাঝে বুদ্ধ স্বীয় কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার দুইটি ভাগ আমরা দেখিতে পাই— সঙ্ঘের ভিতরে ও বাহিরে তাঁহার বিভিন্ন কার্য্যপ্রণালী; কিন্তু আসলে এই উভয়ের কোন বিরোধ ছিল না—উভয় ক্ষেত্রে একই মনোভাবের উদ্দীপনা অনুভূত হয়।

প্রথমতঃ তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীন ধর্ম্মসঙ্ঘে তিনি জাতিভেদের কোনরূপ প্রশ্রয় দিতেন না। তিনি জন্মগত, কর্ম্মগত, পদগৌরব কিম্বা অগৌরবমূলক জাতিভেদের অস্তিত্ব আদৌ স্বীকার করিতেন না। যাগ যজ্ঞানুষ্ঠান, শৌচাশৌচঘটিত যে প্রভেদ ও হীনতার সৃষ্টি হয়, তাহা তিনি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছিলেন।

দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করা যাইতে পারে, হীন নাপিতজাতীয় উপালী তাঁহার সঙ্ঘের একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন, গৌতমের পরেই সঙ্ঘের নিয়মাদি সম্বন্ধে তাঁহার মতামতের প্রাধান্য দেখা যায়। থেরাগাথায় যে সুনীতের পদাবলী উচ্চ আসন লাভ করিয়াছে, তিনিও অস্পৃশ্য জাতিভুক্ত ছিলেন। বৌদ্ধসঙ্ঘে এইরূপ হীনজাতীয় লোকদের প্রবেশাধিকার ছিল, তাহার বহুতর উদাহরণ দেখিতে পাই। কেবলমাত্র এক বিষয়ে দেখিতে পাই, তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ সম্বন্ধীয় প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন, এবং এই বিরোধের সম্যক্ কারণও ছিল। অন্যান্য সম্প্রদায়ের ন্যায় তিনি দাসজাতীয় লোকদিগকে দলভুক্ত করিতে সম্মত হইতেন না। বৌদ্ধ-সঙ্ঘের একটি বিশেষ নিয়ম ছিল যে, পলাতক দাসকে সঙ্ঘভুক্ত করা হইবে না। দীক্ষাকালে অন্যান্য প্রশ্নের উত্তরে দীক্ষার্থীকে আত্ম-পরিচয়ে জানাইতে হইত যে, সে

ক্রীতদাস নহে। যখনই কোন দাসকে সঙ্ঘভুক্ত করা হইত, তখনই সে যে প্রভুর সম্মতিক্রমে কিম্বা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করিয়া এই দীক্ষা গ্রহণ করিল, তাহা বিশেষভাবে জানাইতে হইত।

দ্বিতীয়তঃ—সঙ্ঘের বাহিরে সাধারণ সমাজে, জাতিভেদ সম্বন্ধে কুসংস্কারসকল তিনি ধীমান ব্যক্তির ন্যায় যুক্তিযুক্ত উপদেশ ও সম্যক বিচারবুদ্ধির দ্বারা দূরীভূত করিবার প্রয়াস পাইতেন। সূত্ত নিপাতের কোন কোন সূত্তে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়—যথা, জাতিবিশেষের সহিত একত্র পানভোজন কিম্বা তাহাদের স্পৃষ্ট অথবা পক্ক আহার্য্য গ্রহণে পাপ স্পর্শে না,—কুচিন্তা, কুবাক্য, এবং কুকর্ম্মের দ্বারাই লোকে পাপভাগী হয়। বুদ্ধ-পূর্ব্ব শাস্ত্রেও এই নীতির অভাব নাই, কিন্তু সাধারণতঃ জাতি-ভেদ সম্বন্ধে মতামত তাঁহার নিজস্ব, তাহা আর অন্যত্র দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তিসকল তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে ঃ—বৈজ্ঞানিক, নৈতিক, এবং ঐতিহাসিক। সূত্ত নিপাতের বশিষ্ঠ সূত্তে (যাহার কতকগুলি শ্লোক ধর্ম্মপদে স্থান লাভ করিয়াছে) প্রশ্ন এই যে, মানুষ কিসে ব্রাহ্মণ পদবীর যোগ্য হয়? উত্তরে, বুদ্ধ প্রশ্নকারককে স্মরণ করাইয়া দিতেছেন, উদ্ভিদ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক শ্রেণী নিজ নিজ লক্ষণবিশেষের দ্বারা পরিচিত হইয়া থাকে; কেবলমাত্র মনুষ্যই এই বিশেষত্ববর্জ্জিত। আধুনিক বিজ্ঞানও তাঁহার এই মতের সমর্থন করে। অন্যান্য সূত্তেও তিনি এই একই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, মধুর সূক্তে, কাত্যায়ন এবং মধুর রাজ, এই উভয়ের প্রশ্নোত্তর কথোপকথন আছে। মধুর রাজ বলিতেছেন, "ব্রাহ্মণগণ বলেন, তাঁহারা সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, একমাত্র ব্রাহ্মণগণই সাদা অন্য সকলেই কালা, তাঁহারাই শুদ্ধ, অপর সকল জাতিই অপরিশুদ্ধ, ব্রাহ্মণেরা সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে জন্ম লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার গৌরবের উত্তরাধিকারী—এ সম্বন্ধে আপনার বক্তব্য কি?" উত্তরে কাত্যায়ন বলিলেন, সাধারণ জীবনক্ষেত্রে আমরা সর্ব্বদাই দেখিতে পাই, ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তি সকল বর্ণের দ্বারাই সম্মানিত; এক্ষেত্রে 'দ্বিজ' কোন বিশেষ গৌরব প্রাপ্ত হয়েন না।

দ্বিতীয়তঃ—বর্ণ নির্ব্বিশেষে মনুষ্য মাত্রেই সদসৎকর্ম্ম অনুসারে উচ্চ নীচ জন্ম গ্রহণ করে।

তৃতীয়তঃ—চৌর দস্যু প্রভৃতি অপরাধীগণ যে-কোন বর্ণেরই হৌক না কেন, দুষ্কৃতির জন্য যোগ্য শাস্তি ভোগ করে। পরিশেষে ধর্ম্ম সঙ্ঘভুক্ত যে কোন বর্ণেরই সাধু কি সন্ন্যাসী হউন না কেন, সাধারণের নিকট হইতে সমান শ্রদ্ধা ও সম্মান লাভ করিয়া থাকেন।

এই জাতিভেদ প্রথা সম্বন্ধে বুদ্ধদেব স্বীয় মতামত যাহা ব্যক্ত করিতেন তাহা জনসাধারণে গৃহীত হইয়া সফলপ্রায় হইয়াছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যদি তাঁহার সেই মত ভারতবাসীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিত, তাহা হইলে ভারতের সমাজ-নীতি পাশ্চাত্য আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিত সন্দেহ নাই, এবং এই দেশের আধুনিক জাতিভেদ-প্রথা আর মাথা তুলিতে পারিত না।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

সঙ্ঘের নিয়মাবলী।

প্রবেশ।—

বৌদ্ধ সঙ্ঘের অবারিতদ্বার, যাহার ইচ্ছা প্রবেশ করিতে পারে; প্রথম প্রথম প্রবেশ নিয়মের কঠোরতা ছিল না। বুদ্ধদেবের জীবদ্দশায় যে-সকল শিষ্য ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইত, তাহাদের পরীক্ষার কাল সামান্যতঃ ৪ মাস নিরূপিত ছিল, কিন্তু যোগ্য পাত্র হইলে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম ঘটিত। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলি, বুদ্ধ যখন মল্লদের শালবনে মৃত্যুশয্যায় শয়ান, সেই সময় সুভদ্র নামক একটী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আনন্দকে ডাকিয়া বলিলেন "আমি অনেকানেক বয়োবৃদ্ধ সাধু পুরুষের নিকট শুনিয়াছি তথাগত বুদ্ধের আবির্ভাব জগতে দুর্লভ, তিনিই এইক্ষণে আবির্ভূত হইয়াছেন। আজ রাত্রে না কি শ্রমণ গৌতম ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন। আমার মনে নানা সংশয় আসিয়া সত্যকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, আমার ধ্রুব বিশ্বাস এই যে, একমাত্র শ্রমণ গৌতম সেই সকল সন্দেহ দূর করিতে সক্ষম। আমি তাঁহার দর্শন লাভের আশায় আসিয়াছি—তাঁহার কি দর্শন পাইব?"

আনন্দ কহিলেন—"এখন থাক্—আর না—তথাগতকে আর বিরক্ত করিও না। তিনি এখন পীড়িত।"

এই কথোপকথন ভগবান বুদ্ধ তাঁহার রোগশয্যায় শুনিতে পাইয়া আনন্দকে ডাকিয়া কহিলেন—"আনন্দ! সুভদ্রকে আসিতে দেও। তিনি জ্ঞানলাভ মানসে আসিয়াছেন, আমাকে বিরক্ত করিবার জন্য নয়। তিনি যাহা শুনিতে চান আমি সাধ্যমত উত্তর দিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিব, তাঁহাকে আসিতে বারণ করিও না।"

তাঁহার অনুমতি ক্রমে সুভদ্র তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। সুভদ্র প্রথমে ষট্‌তীর্থকরের* প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া

---

*পূরণ কাশ্যপ, মস্করী গোশাল, অজিত কেশকম্বল, ককুধ কাত্যায়ন, সঞ্জয় বেলাস্থিপুত্র, নির্গ্রন্থ নাথপুত্র, বুদ্ধের সময় এই ছয়জন উপাধ্যায়ের নাম শুনা যায়। ইহাঁরা ষটতীর্থকর বলিয়া পরিচিত।

জনসমাজে ইহাঁদের খ্যাতি প্রতিপত্তি বিলক্ষণ ছিল। ইহাঁদের প্রত্যেকের বহুসংখ্যক শিষ্য ছিল। সারীপুত্র ও মুদ্‌গলায়ন—বুদ্ধের যে দুই প্রধান শিষ্য—তাঁহাদের আদি গুরু সঞ্জয়। ইহাঁরা ছয়জন বুদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন, এবং বুদ্ধদেবকে অপদস্থ করিবার বিস্তর প্রয়াস পাইয়াছিলেন; কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই।

প্রথমে তাঁহারা রাজা বিম্বিসারের নিকট গিয়া বুদ্ধের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। সেখানে বিফলমনোরথ হইয়া কোশলরাজ প্রসেনজিতের নিকট গমন করেন, এবং তাঁহাকে নানা যাদুকরী কৌশল দেখাইয়া চমকিত করেন। কিন্তু বুদ্ধদেবের অলৌকিক ঋদ্ধিপ্রভাবে তাঁহাদের ছলবল সকলি ব্যর্থ হয়। বুদ্ধদেব যখন ধর্ম্ম প্রচারের জন্য শ্রাবস্তী বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এই তীর্থিকগণ তাঁহার বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্র করেন। তাঁহারা একদিন চিঞ্চানামক এক রমণীকে কুমন্ত্রণা দিয়া বুদ্ধের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাহার দুই তিন মাস পরে প্রচার করেন যে চিঞ্চা গর্ভবতী হইয়াছে, এবং বুদ্ধই এই গর্ভের কারণ। ক্রমে তীর্থিকদের ষড়যন্ত্র প্রকাশিত হইয়া পড়ে, এবং এই অপবাদ সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া প্রমাণিত হয়। অবশেষে তাঁহারা অগত্যা হার মানিয়া নিতান্ত দীনভাবে কালহরণ করিতে লাগিলেন। প্রবাদ এই যে, তাঁহাদের অগ্রণী পূরণকাশ্যপ জলে ডুবিয়া আত্মহত্যা করেন।

জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন! এই ধর্ম্মোপদেশকদের উপদেশ শ্রেয়স্কর কি না? তাঁহারা শাস্ত্রে অভিজ্ঞ কি না?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন—ঐ সকল তীর্থকরের অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া কোন ফল নাই। আমি তোমাকে যে ধর্ম্মের উপদেশ দিতেছি, তাহা মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর। হে সুভদ্র, যে ধর্ম্মে সম্যক দৃষ্টি, সম্যক সঙ্কল্প, সম্যক বাক্, কর্ম্মান্ত, আজীব প্রভৃতি অষ্ট আর্য্যমার্গের উপদেশ নাই, সে ধর্ম্ম নিরর্থক; যে ধর্ম্মে অষ্ট মহামার্গের উপদেশ আছে, তাহাই শিক্ষণীয়। হে সুভদ্র, আমি ২৯ বৎসর বয়ঃক্রম কালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি, তদনন্তর ধর্ম্মের অন্বেষণে ৫১ বৎসর প্রজ্ঞা ও সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াছি। যাহারা আমার আচরিত ন্যায় ও ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয় নাই, তাহারা শ্রমণ হইবার যোগ্য নহে।—এইরূপে তিনি সুভদ্রকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিয়া সদ্‌ধর্ম্ম কি তাহা বুঝাইয়া দিলেন। সুভদ্র কহিল "আপনার জ্ঞানগর্ভ উপদেশ শ্রবণে আমি ধন্য হইলাম, যাঁহা গুহ্য ছিল তাহা মুক্ত হইল, যাহা ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে তাহা গড়িয়া তুলিলেন। বিপথগামীকে আপনি সরল পথ প্রদর্শন করিলেন। আমার সমক্ষে সত্যধর্ম্ম প্রকাশিত করিলেন, অদ্য হইতে আমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের শরণাপন্ন হইতেছি—প্রভু, আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।"

বুদ্ধ কহিলেন "যে কোন ব্যক্তি আমার এই ধর্ম্ম ও সঙ্ঘে দীক্ষিত হইবার প্রার্থনা করে, সাধারণ নিয়মানুসারে তাহার পরীক্ষার কাল চার মাস। কিন্তু তোমাকে অব্যাহতি দিলাম—

তুমি এখন্ হইতে সঙ্ঘভুক্ত হইলে।" এই বলিয়া আনন্দকে ঐরূপ আদেশ করিলেন। আনন্দ সুভদ্রের মস্তকমুণ্ডন ও তাঁহাকে বসনত্রয় পরিধান করাইয়া এবং ত্রিশরণ মন্ত্র দিয়া শিষ্যদলে গ্রহণ করিলেন; পরে তিনি আসিয়া ভগবান বুদ্ধের পার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। সুভদ্র বৌদ্ধ ভিক্ষুকরূপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন, এবং সাধনার গুণে কালক্রমে তিনি অর্হৎ পদে উন্নীত হইলেন। ইনিই বুদ্ধের স্বহস্ত-দীক্ষিত শেষ শিষ্য। (মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র)

ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে যে, বুদ্ধের সময় দীক্ষা বিধির কোন আড়ম্বরময় অনুষ্ঠান ছিল না। কালক্রমে প্রবেশিকার কতকগুলি বিশেষ নিয়ম প্রবর্ত্তিত হইল। যাহারা কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী, কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত, রাজ ভৃত্য বা সৈনিক পদধারী, তাহাদের প্রবেশ নিষেধ। ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি এবং অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক পিতামাতার সম্মতি ব্যতীত সংঙ্ঘ প্রবেশের অনধিকারী, বারো বৎসরের নীচে কেহ প্রথম সোপানে পদার্পণ করিতে পারিবে না—২০ বৎসরের কমে ভিক্ষুর পূর্ণাধিকার প্রাপ্ত হইবে না। সঙ্ঘের দুই সোপান—প্রথম, প্রব্রজ্যা—দ্বিতীয়, উপসম্পদা। কোন গৃহস্থ ভিক্ষু-সঙ্ঘভুক্ত হইবার প্রার্থী হইলে নিয়মিত দিবসে দশ অথবা দশাধিক ভিক্ষু একত্রিত হন। প্রার্থীকে একজন ভিক্ষু সভ্যস্থলে আনয়ন করিলে পর তিনি স্থবিরদিগকে প্রণাম করিয়া যথাসাধ্য গুরুদক্ষিণা দিয়া উপবিষ্ট হয়েন। তৎপরে তিনবার সঙ্ঘে নিবেদন করেন "আমাকে অনুগ্রহ করিয়া দীক্ষাদান করুন,

যাহাতে আমি দুঃখ শোক অতিক্রম করিয়া নির্বৃতি লাভের অধিকারী হইতে পারি।” সঙ্ঘপতি তাহার স্কন্ধে ভিক্ষুর বসন-ত্রয়ের গাঁঠ্‌রী ঝুলাইয়া দেন। প্রার্থী বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক সন্ন্যাসীবেশে সমাগত হইয়া তিনবার মন্ত্রদ্বয় পাঠ করেন :—

প্রথম—ত্রিশরণ মন্ত্র (বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি ইত্যাদি); দ্বিতীয়—দশশীল মন্ত্র, যথা—

১। জীবহত্যা, ২। অপহরণ, ৩। ব্যভিচার, ৪। মিথ্যাকথন, ৫। সুরাপান, এই পঞ্চপাপ হইতে নিবৃত্তি—সাধারণ নিষেধ।

৬। অকাল ভোজন, ৭। নৃত্যগীতাদিতে অনুরক্তি, ৮। গন্ধমাল্য প্রভৃতি সেবন, ৯। আরাম শয্যায় শয়ন, ১০। সোণারূপা গ্রহণ, এই পঞ্চব্যসন হইতে নিবৃত্তি—ভিক্ষুদিগের প্রতি বিশেষ বিধান।

পরিবাসোত্তীর্ণ যুবকের সঙ্ঘে পূর্ণ প্রবেশ কালে স্বতন্ত্র দীক্ষা বিধি অনুষ্ঠিত হয়; তাহার নাম উপসম্পদা। ভিক্ষু যুবক সঙ্ঘ সমীপে উপনীত হইয়া স্থবিরদের মধ্য হইতে একজন উপাধ্যায় বাছিয়া লন। পরে ভিক্ষাপাত্র তাহার স্কন্ধে সংলগ্ন হয়। তৎপরে উপাধ্যায়ের নাম কি? তিনি ভিক্ষাপাত্র ও বসনত্রয় পাইয়াছেন কি না? তিনি কুষ্ঠ প্রভৃতি মহাব্যাধিগ্রস্ত কি না? তাঁহার বয়স কত? তিনি স্বাধীন কিনা? দীক্ষায় তাঁহার অভিভাবকের সম্মতি আছে কিনা? এই সকল প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর পাইলে পরীক্ষার ফলাফল সঙ্ঘে জানান হয়। পরে যুবক দীক্ষার জন্য তিনবার প্রার্থনা করেন, কাহারও কোন আপত্তি না থাকিলে সঙ্ঘভুক্ত হন। সঙ্ঘের নিয়মাবলী

পঠিত হইবার পর তিনি বৈধরূপে গৃহীত হন। দীক্ষার পর আচার্য্যের নিকট ৫ বৎসর অধ্যয়নের নিয়ম আছে। দীক্ষিত বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীর নাম ভিক্ষু অথবা শ্রমণ, ইহাদের ব্রত সংযম এবং দারিদ্র্য।

দীক্ষা বিধি সমাপ্ত হইলে দীক্ষিতের কর্ত্তব্যগুলি আচার্য্য উপদেশ করেন—

আহার, ভিক্ষা করিয়া যাহা সংগ্রহ করা যায়।

পরিচ্ছদ, স্বহস্ত-স্যূত চীরপুঞ্জ।

বাসস্থান, অরণ্যের বৃক্ষতল।

ঔষধ, গোমূত্র।

চতুরনুশাসন—

ব্যভিচার করিবেক না।

চুরি করিবেক না।

জীব হত্যা করিবেক না।

আপনাতে দৈবশক্তি আরোপ করিবেক না।

এই শেষ অনুশাসনটী জারী হইবার বোধহয় বিশেষ কারণ ছিল, কেন না বিনয় পিটকে দেখা যায়, এক সময়ে বৃজী প্রদেশে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। তাহাতে একদল ভিক্ষু মহা কষ্টে পড়ে। কেহ কেহ গৃহস্থ ঘরে চাকুরি করিয়া জীবিকা উপার্জ্জন করিবার প্রস্তাব করিলেন; এক জন ধূর্ত্ত ভিক্ষু এক ফন্দী বাহির করিল,—এস আমরা সিদ্ধ যোগী বলিয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া পরস্পরকে খুব বাড়াইয়া তুলি,—'এই ভিক্ষু মহা সাধু,' 'ইনি ত্রিবিদ্যা কণ্ঠস্থ করিয়াছেন', 'ইনি সিদ্ধ যোগী'। তাঁহার মতলব

সিদ্ধ হইল। গৃহস্থেরা বলিল, এই সকল মহাপুরুষেরা আমাদের মধ্যে বর্ষা যাপন করিতে আসিয়াছেন, আমাদের পরম ভাগ্য বলিতে হইবে। তাহাদের দানও সেই পরিমাণে ফাঁপিয়া উঠিল, ভিক্ষুরা খাইয়া পরিয়া হৃষ্টপুষ্ট হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে লাগিল। এইরূপ ভণ্ডামি নিবারণের জন্য চতুর্থ অনুশাসনটী উপদেশের মধ্যে নিবিষ্ট হইয়া থাকিবে।

সঙ্ঘদলে যেমন প্রবেশ সহজ, সঙ্ঘ হইতে নির্গমণও তেমনি সহজ। চৌর্য্য খুন প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ভিক্ষু বহিষ্কার দণ্ডযোগ্য—তাহা ছাড়া স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সঙ্ঘ ছাড়িয়া যাইবার কোন বাধা নাই। যিনি বলিবেন পিতা মাতার জন্য আমার ভাবনা হইতেছে, স্ত্রী পুত্রের জন্য আমার ভাবনা হইতেছে, আমার পূর্ব্বকার জীবনের জন্য ভাবনা হইতেছে, তিনি সঙ্ঘ ছাড়িয়া সংসারে ফিরিয়া যাইতে পারেন। হয় একাকী কাহাকেও কিছু না বলিয়া কহিয়া চলিয়া যাইতে পারেন, কিম্বা একজন ভিক্ষুকে সাক্ষী মানিয়া বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘ পরিত্যাগ করিয়া যাইতে পারেন,—কেহ তাঁহাকে বারণ করিবে না। সঙ্ঘের প্রবেশ-দ্বার যেমন মুক্ত, নির্গমণের পথও তেমনি সোজা—কোন দিকে কোন কণ্টক নাই।

ভিক্ষুদের আহার পরিচ্ছদ ইত্যাদি বিষয়ে অনেক খুঁটিনাটি নিয়ম আছে, সে সমস্ত দেখিতে যত কঠোর কার্য্যতঃ তত নয়; অনেক বিষয়ে শৈথিল্য দৃষ্ট হয়, বাঁধাবাঁধির মধ্যেও কতকটা স্বাধীনতা আছে।

আহার।

ভিক্ষুরা একাহারী; দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা পর্য্যটন পূর্ব্বক

আহার্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে একস্থানে একত্রে ভোজন করা ইহাদের নিয়ম। ভিক্ষার সময় কোন কথা কহিবেক না। যদি কেহ ভিক্ষা দান করে, তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া অন্য দ্বারে গমন করিবে; কিছু না পাইলেও মৌনভাবে পরদ্বারে চলিয়া যাইবে। অনেক সময়, বিশেষতঃ পূর্ণিমার দিনে, গৃহস্থ ব্যক্তি ভিক্ষুদিগকে মধ্যাহ্ন ভোজনে নিমন্ত্রণ করিত, ভিক্ষুমঠে আহার পাঠাইয়া দিবারও রীতি ছিল।

পরিচ্ছদ।

স্বহস্ত-স্যূত চীরপুঞ্জ পরিধান করা নিয়ম, কিন্তু কেহ বস্ত্র দান করিলে তাহা গ্রহণ করা নিষেধ নহে। গৈরিক বসনত্রয় ভিক্ষুকের পরিধেয়,—অন্তর-বাসক, মধ্য-বসন, আর উত্তরীয়। 'কসায়' (পাপ) হইতে বিমুক্ত না হইলে 'কাষায়' অর্থাৎ গেরুয়া বসনের যোগ্য হয় না। এতদ্ভিন্ন কোন বেশভূষা ব্যবহারের বিধান নাই। মস্তক ও শ্মশ্রু মুণ্ডন ভিক্ষুদলের সন্ন্যাস ব্রতের বাহ্য লক্ষণ।

বাসস্থান।

বুদ্ধ মনে করিতেন যে, নির্জ্জন বনবাস আত্ম-সংযম শিক্ষার প্রকৃষ্ট সাধন, কিন্তু বিজন বাস করিতেই হইবে এরূপ কোন নিয়ম প্রচারিত হয় নাই। ভিক্ষুদের দলবদ্ধ হইয়া থাকিবারই রীতি ছিল। তাহারা উদ্যানে, বনে, গ্রাম ও নগরের প্রান্তে, যেখানে মন যায় দলে দলে বাস করিত; ক্রমে তাহাদের জন্য মঠ বিহার প্রভৃতি বাসগৃহ প্রস্তুত হইল। গ্রীষ্ম ও শীতের সময় দেশ ভ্রমণ, বর্ষার ৩ মাস একস্থানে স্থির হইয়া বসা,—এই

তাহাদের নিয়ম। কিন্তু অরণ্যই যাহাদের প্রশস্ত বাসস্থান, তাহারাই ভারতে গৃহনির্ম্মাণ কৌশলের সূত্রপাত করিয়া যায়। ভারতবর্ষের নানা স্থানে যে স্তূপ চৈত্য বিহারের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়, তাহা তাহাদেরই হস্ত-রচনা। গিরি খুদিয়া গুহাশ্রম নির্ম্মাণ করায় যে কি বিপুল পরিশ্রমের ব্যয়, তাহা যিনি দেখিয়াছেন তিনিই বুঝিতে পারেন। এই সকল গিরিমন্দির কোন কোনটা দ্বিতীয় বা তৃতীয় খৃষ্টাব্দে বিরচিত। এইরূপ নির্ম্মাণের উৎকৃষ্ট নমুনা পুণা সমীপস্থ কার্লীগুহা খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দে রচিত হয়। হিন্দুদের দেবদেবীমন্দির সে দিনকার রচনা—যেন বৌদ্ধমন্দিরের দেখাদেখি তাহাদের সূত্রপাত মনে হয়; আর যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কঠোর জ্ঞান ও নীতির ধর্ম্ম, যাহাতে ভজন পূজনের বিধি ব্যবস্থা কিছুই নাই, ক্রিয়া কাণ্ডের কোন বাহ্যাড়ম্বর নাই, আশ্চর্য্য যে তাহার সেবকেরাই প্রকাণ্ড শিলাস্তম্ভ স্তূপ চৈত্য বিহার প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের হস্তচিহ্নসকল নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত করিয়া গিয়াছেন। বিহার ও চৈত্য ব্যতীত বৌদ্ধেরা তাহাদের তীর্থক্ষেত্রে বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ ঘণ্টাকৃতি স্তূপসমূহ নির্ম্মাণ করিত, কোন কোন স্তূপ আশ্চর্য্য কারুকার্য্যময় রেলিং বেষ্টিত; এই সকল স্তূপের মধ্যে ভূপালের অন্তর্গত ভিল্‌সা স্তূপ সুপ্রসিদ্ধ। কাশীযাত্রীগণ সারনাথ ক্ষেত্রের ভগ্নাবশেষ দর্শন করিয়াছেন; তাঁহারা সেখানকার স্তূপও দেখিয়া থাকিবেন, তাহা সেই ক্ষেত্র স্মরণ করাইয়া দেয় যেখানে গৌতম তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। এতদ্ভিন্ন গিরিগুহা-নিহিত চৈত্য বিহার

প্রভৃতি কোথায় না প্রক্ষিপ্ত ? সপ্তপর্ণী,—যেখানে প্রথম বৌদ্ধ-সভার অধিবেশন হয়,—নাসিকের লেনা, কার্লী, অজন্তা, সাল্‌সেট্‌ দ্বীপস্থিত কাহ্নেরীর গুহামন্দির, ভুবনেশ্বরের খণ্ডগিরি উদয়-গিরির গুহাশ্রম, এই সমস্ত চিরস্মরণীয় বৌদ্ধকীর্ত্তি ভারতে প্রকীর্ণ দেখা যায়।

দারিদ্র্য ব্রত।—

দারিদ্র্য ও সংযম, বৌদ্ধমণ্ডলীর এই দুই মহাব্রত। সোনা রূপা গ্রহণ করা তাহাদের একেবারেই বারণ,—যদি কোন গৃহস্থ দান করেন, ভিক্ষু তাহা নিজের জন্য রাখিতে পারিবেন না। হয় তাহা দাতাকে প্রত্যর্পণ করিতে হইবে, কিম্বা অন্য কোন গৃহস্থের হস্তে অর্পণ করিতে হইবে, যিনি তাহার বিনিময়ে ঘৃত লবণ তৈল তণ্ডুল প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্য সকল দান করিলে, তাহা অপর ভিক্ষুদের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে, নিজের জন্য নয়। সোনা রূপার ব্যবহার লইয়া অতি প্রাচীন কাল হইতে ভিক্ষুদলে মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হয়, এবং বৈশালী সভায় এই বিষয় লইয়া বিষম আন্দোলন হয়। যে সকল ভিক্ষু এই নিয়ম পরিবর্ত্তনের পক্ষপাতী ছিলেন, অবশেষে তাহাদেরই পরাভব হইল, এবং অনেক শতাব্দী পর্য্যন্ত এই নিবৃত্তি ব্যবস্থা ভিক্ষু মণ্ডলীর মধ্যে সুরক্ষিত থাকে। ইহা ছাড়া ভূমি দাস দাসী রাখা, অথবা অশ্ব গো মেষাদি পশু পালন করা ভিক্ষুদের নিষেধ। চাষবাস কৃষিকার্য্যও নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয়। এক কথায়, ভিক্ষুর পক্ষে দারিদ্র্য ব্রত প্রাণপণে পালন করা বিধেয়। তাঁহাদের বিষয় সম্পত্তি সব মিলিয়া অষ্টবিধ—বসনত্রয়, কটিবন্ধ,

ভিক্ষাপাত্র, ক্ষুর, সূচি, জীবহত্যা নিবারণোপযোগী জল ছাঁকিবার বাসন। যদিও প্রত্যেক ভিক্ষুর জন্য এই ব্যবস্থা, তথাপি ভিক্ষুসঙ্ঘের কথা স্বতন্ত্র। গ্রন্থ প্রভৃতি অস্থাবর বস্তু ছাড়িয়া দেও, ভূমি বিহার প্রভৃতি স্থাবর সম্পত্তি, সঙ্ঘ তাহারও অধিকারী ছিল। বুদ্ধদেব স্বয়ং সঙ্ঘের জন্য এই সমস্ত উপহার গ্রহণ করিতেন, তাহার অনেক দৃষ্টান্ত দেখা গিয়াছে। বৌদ্ধ ভিক্ষু প্রত্যেকে যতই নির্ধন হউন না কেন, অনেকানেক বৌদ্ধ-ক্ষেত্র রাজা ও শ্রীমন্ত গৃহস্থের প্রসাদে বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী ছিল সন্দেহ নাই; ইউরোপের মধ্যযুগের খৃষ্টীয় দেবালয় অপেক্ষা তাহাদের ধনসম্পত্তি অল্প ছিল না।

পূজা।—

আমরা দেখিয়াছি বৌদ্ধধর্ম্ম নীতিপ্রধান ধর্ম্ম, তাহাতে বৈদিক হোম যাগ ক্রিয়াকলাপ নাই—যজ্ঞে পশুবলি তাহার অহিংসাধর্ম্মের অনুমোদিত নহে। ব্রাহ্মণ্যের ভজন পূজনের বিধিব্যবস্থাও তাহাতে নাই। বৌদ্ধদের দেবপূজার পাত্র ও প্রণালী স্বতন্ত্র, এবং দেবালয় প্রভৃতি পূজার উপকরণও নাই। ধর্ম্ম সাধনের জন্য আশ্রম চাই, তাই দেবমন্দিরের বদলে বৌদ্ধ ক্ষেত্র সাধকমণ্ডলীর বাসোপযোগী চৈত্য বিহারে সমাকীর্ণ। তবে কি বৌদ্ধ শাস্ত্রে পূজার নিয়ম আদতেই নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতে পারে যে, আমরা যাহাকে সহজ ভাষায় পূজা বলি—কোন দেবতাকে লক্ষ্য করিয়া স্তব স্তুতি প্রার্থনা—এরূপ সাধনা আদি বৌদ্ধধর্ম্মের অঙ্গ নহে। বুদ্ধের ধর্ম্মোপদেশে দেবারাধনার কোন বিধান নাই, এমন কি,

বুদ্ধদেব স্পষ্টই বলিয়া গিয়াছেন যে—হে ইন্দ্র, হে সোম, হে বরুণ, এইরূপ প্রার্থনার কোন ফল নাই। বৌদ্ধ জগতে স্বয়ং বুদ্ধদেব দেবতার আসনে আসীন ছিলেন। তিনি যতকাল জীবিত ছিলেন, ততকাল তাঁহার মুখ পানে চাহিয়া ভক্তেরা তাঁহার আদিষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিত, এবং তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর কালক্রমে বুদ্ধই দেবাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। বুদ্ধ ছাড়া বোধিসত্ত্ব-কল্পনা বৌদ্ধদের মধ্যে কিরূপে উদয় হইল, তাহার বিবরণ পরে দেওয়া যাইবে। এইক্ষণে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, হিন্দু দেবদেবী আর বৌদ্ধ দেবতা, ইহাঁদের মধ্যে এক বিষয়ে পার্থক্য আছে। হিন্দু শাস্ত্রের মতে রাম-কৃষ্ণাদি দেবগণ মনুষ্যজন্ম ধারণ করিয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হন; বৌদ্ধ মতে মনুষ্যগণ সাধনাগুণে অর্হৎ, বোধিসত্ত্ব, বুদ্ধ এইরূপে উত্তোরোত্তর দেবত্ব-পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সে যাহা হউক, মোটামুটি বলা যাইতে পারে যে, বৌদ্ধদের মধ্যে আমাদের মত দেবপূজার ব্যবস্থা নাই—ব্রাহ্মণ্যের দেবতার স্থানে বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত—তাহাদের লইয়াই বৌদ্ধদের পূজার্চ্চনা।—এই সকল দেবতার মধ্যে বুদ্ধদেবের সর্ব্বোচ্চ আসন—ভক্তি শ্রদ্ধা সহকারে বুদ্ধের অর্চ্চনা—তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন রক্ষণ—তীর্থ দর্শন—তাহা ছাড়া তাঁহার উপদিষ্ট ধর্ম্ম পালন—এই সমস্তই পূজার সাধন।

ভাবনা ধ্যান সমাধি।-

অন্যান্য ধর্ম্মে যেমন দেবারাধনা, স্তুতি প্রার্থনা, ভজন পূজনের ব্যবস্থা আছে, বৌদ্ধদের সেইরূপ ভাবনা ধ্যান ও সমাধি।

বিষয় বাসনা হইতে বিরত হইয়া ভিক্ষুদিগকে বিরলে পঞ্চ ভাবনা সাধন করিতে হয়।—মৈত্রী, করুণা, মুদিত, অশুভ ও উপেক্ষা, ভাবনা এই পাঁচ প্রকার।

মৈত্রী—কি দেবতা কি মনুষ্য সকল জীবই সুখী হউক, শত্রুরও কল্যাণ হউক, সকলেই রোগ শোক পাপ তাপ হইতে মুক্ত হউক, এইরূপ শুভ চিন্তাকে মৈত্রী ভাবনা বলে।

করুণা—দুঃখীর দুঃখে সমবেদনা অনুভব করা, জীবের কিসে দুঃখ মোচন ও সুখ বর্দ্ধন হয়, অহরহ এইরূপ চিন্তা করা করুণা ভাবনা।

মুদিত—ভাগ্যবান ব্যক্তির সুখে সুখী হওয়া, তাহাদের সুখ সৌভাগ্য স্থায়ী হউক, এই চিন্তা মুদিত ভাবনা।

অশুভ—শরীর ব্যাধিমন্দির, তড়িৎসম ক্ষণস্থায়ী, মরীচিকার ন্যায় অসত্য, এবং মূত্রপূরিষে, পরিপূর্ণ ঘৃণিত বস্তু, মানব জীবন জন্মমৃত্যুর অধীন, দুঃখময় ও ক্ষণভঙ্গুর, এইরূপ ভাবনাকে অশুভ ভাবনা বলে।

উপেক্ষা—সকল জীবই সমান, কোন প্রাণী অপর প্রাণী অপেক্ষা অধিকতর প্রীতি বা অধিকতর ঘৃণার আস্পদ নয়; বল দুর্ব্বলতা, দ্বেষ মমতা, ধন দারিদ্র্য, যশ অপযশ, জরা, যৌবন সুন্দর অসুন্দর, সকল গুণ, সকল অবস্থাই সমান—এই সাম্য ভাবনা উপেক্ষা ভাবনা বলিয়া অভিহিত হয়।

ভিক্ষুগণ প্রাতঃসন্ধ্যা বিরলে বসিয়া এই পঞ্চ ভাবনা অভ্যাস করিতেন।

ধ্যান।—

বৌদ্ধমতে ধ্যান পরম পদার্থ। জীবনের মহান উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে হইলে ধ্যান ও সমাধি দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধন একান্ত আবশ্যক। যে সকল বিষয় চিত্তকে সেই মহান লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত করে, সেই সমস্ত দূর করিতে হইবে—"তত্রতত্রাভিনন্দিনী" চিত্তবৃত্তি, অর্থাৎ প্রজাপতির ন্যায় ফুল হইতে ফুলে রমণ করিতে চায় এমন যে চপলা প্রবৃত্তি, তাহা বশীকৃত করিয়া বিষয়াসক্তি হইতে বিরত হইতে হইবে; এইরূপ নির্লিপ্ত ভাবে নির্জনে ধ্যানানন্দ উপভোগ করা ধ্যানের প্রথম সোপান। ধ্যানের এইরূপ উত্তরোত্তর চারিটী সোপান আছে। উচ্চ হইতে উচ্চতর ধাপে উঠিতে হইলে চিত্তকে অধিকতর সংযত করিয়া যে বিষয়টী ভাবিতেছ তাহার সহিত একান্ত তন্ময় হইয়া যাওয়া আবশ্যক। ধর অরূপলোকের ধ্যান করিতেছ—রূপলোকের সমুদায় কল্পনা মন হইতে দূর করিতে হইবে, এই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অগোচর অলৌকিক ভাব ও অবস্থায় চিত্তের তন্ময়তা সাধন করিতে হইবে, যেন তুমি এ পৃথিবীর জীব নও, অরূপলোকে বাস করিতেছ। বৌদ্ধমতে কঠিন যোগ সাধনা দ্বারা কোন কোন যোগী এই প্রকার অলৌকিক শক্তি-বাহিনী সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। ধ্যানবলে ধ্যানের বিষয়ের সহিত যে পরিমাণে তন্ময়ীভাব হইবে, সেই পরিমাণে সিদ্ধিলাভ। ধ্যানের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা সেই, যাহাতে জীব সুখ দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া শাশ্বত শান্তিরসে নিমগ্ন হয়েন—যে অবস্থায় ভাবজ্ঞানও নাই, অভাব

জ্ঞানও নাই, কেবল স্মরণমাত্র অবশিষ্ট থাকে, চিত্ত শান্তি-সলিলে মগ্ন হয়। এই মহা ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

সমাধি।—

বহির্বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আত্মার একাগ্রতা সাধনের নাম সমাধি। পঞ্চভূত অনিত্য ও পরিবর্ত্তনশীল, একাগ্রচিত্ত হইয়া এই সমস্ত অনিত্য ভাবাদি পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিবে। করিতে করিতে সেই ভাব মনোমধ্যে নিতান্ত পরিস্ফুট হইয়া উঠিবে। সমাধি ইহার উত্তরীয় অবস্থা। গৌতমবুদ্ধ যে সমগ্র চারি প্রকার ধ্যানের অনুষ্ঠান করেন, তাহার দ্বিতীয় ধ্যানটী সমাধিজাত বলিয়া লিখিত আছে। সমাধি দ্বারা ছয় প্রকার অভিজ্ঞা উপার্জ্জন করা যায়; দিব্য দর্শন, দিব্য শ্রবণ, অন্যের মনোভাব পরিজ্ঞান, পূর্ব্বজন্ম স্মৃতি, রিপুদমন ক্ষমতা, অলৌকিক শক্তি (ঋদ্ধি) অর্জন।

তীর্থদর্শন।—

পূজার অপর অঙ্গ তীর্থদর্শন অতি প্রাচীন কাল হইতেই বৌদ্ধ সমাজে প্রচলিত দেখা যায়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে চারিটী তীর্থ নির্দ্দিষ্ট আছে—

১। যেখানে বুদ্ধের জন্ম
২। যেখানে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি
৩। যেখানে তিনি ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তিত করেন
৪। যেখানে তাঁহার নির্ব্বাণ

এই সকল স্থান পরিদর্শন মানসে ভিক্ষু ভিক্ষুণী উপাসক উপাসিকা তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন। বুদ্ধদেব বলিয়া গিয়াছেন যিনি এই চতুস্তীর্থ দর্শন করিয়া দেহত্যাগ করেন, তিনি মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন।

এই সমস্ত বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র এখন কতক ভগ্ন, কতক ভগ্নপ্রায়, কতক রূপান্তরিত, কতক বা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

কপিলবস্তু।—

বুদ্ধদেবের জন্মভূমি যে কপিলবস্তু, সে এখন কোথায়? তাঁহার জীবদ্দশাতেই তাহার ধ্বংস হয়। তিনি নিজে ত রাজ্যত্যাগ করিয়া ধর্ম্মপ্রচারে জীবন উৎসর্গ করিলেন, পরে তাঁহার পুত্র রাহুল ও আত্মীয় স্বজনকে স্বপক্ষে আনিয়া রাজ্যের স্তম্ভসকল শিথিল করিয়া দিলেন—ইহাদের বিয়োগে তাঁহার পিতার যে ভয়ানক কষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কষ্টের কারণ যথার্থই ছিল। ছিদ্র পাইয়া বাহির হইতে শত্রুদল রাজ্য আক্রমণ করিল। বুদ্ধের নির্ব্বাণের তিন বৎসর পূর্ব্বে কোশলাধিপতি প্রসেনজিতের পুত্র ও উত্তরাধিকারী কপিলবস্তু ধ্বংস এবং শাক্যবংশ নিপাত করেন। চীন পরিব্রাজকেরা এই বিখ্যাত নগরীর ভগ্নাবশেষ মাত্র দেখিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহার চিহ্নমাত্রও রহিল না। সম্প্রতি বিস্তর অনুসন্ধানের পর প্রত্নতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা অশোকের একটি খোদিত স্তম্ভ হইতে কপিলবস্তুর বাস্তুভূমি

নেপাল সমীপে নির্ণয় করিয়াছেন। হুয়েন সাঙের বর্ণনা অনুসারে ঐ স্তম্ভ আবিষ্কৃত হয়।

বুদ্ধ গয়া।—

এই স্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইয়াছিলেন বলিয়া ইহা বৌদ্ধদের মহাতীর্থ; Jerusalem যেমন খৃষ্টানদের, বৌদ্ধদের পক্ষে ইহাও সেইরূপ। ইহার সঙ্গে বুদ্ধদেবের অশেষ স্মৃতিচিহ্ন জড়িত আছে। অশোক রাজা এইস্থানে এক বৌদ্ধ মন্দির নির্ম্মাণ করেন—এই মন্দির মধ্যে মধ্যে ভগ্ন ও নবীকৃত হয়, এইক্ষণে আবার পুনর্নবীকৃত হইয়া হুয়েন সাঙের বর্ণনানুযায়ী তাহার পূর্ব্বাকার ধারণ করিয়াছে। এইক্ষণে আর সেই বোধিবৃক্ষ নাই, যাহার তলে বুদ্ধের বোধনেত্র খুলিয়াছিল। মন্দিরের পিছনে তাহার প্রতিনিধি স্বরূপ এক অশ্বত্থ বৃক্ষ তৃতীয় খৃষ্টাব্দে রোপিত হয়, এখন তাহাই আছে। প্রবাদ এই যে, মূল বৃক্ষের এক শাখা মহেন্দ্রের ভগিনী সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে লইয়া যান, সেখানে তাহা প্রকাণ্ড অশ্বত্থে পরিণত হইয়াছে। হায়, বৌদ্ধ ধর্ম্মেরও দশা এইরূপ! জন্মভূমি হইতে বিতাড়িত হইয়া পরদেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বুদ্ধ-গয়ার বোধিবৃক্ষ কোথায় কি অবস্থায় ছিল, তাহা হুয়েন সাঙের ভ্রমণবৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। বৃক্ষের পূর্ব্বভাগে স্বর্ণামলক-চূড় এক বিহার ছিল, তাহার প্রবেশ-দ্বারের কুলুঙ্গিতে একদিকে অবলোকিতেশ্বর, অন্যদিকে মৈত্রেয়ের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। বৃক্ষের উত্তরে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব পাইবার পর পদচারণ করিতেন। তিনি সাতদিন ধ্যানমগ্ন থাকেন, পরে উঠিয়া

যেখানে তিনি সাতদিন পায়চারি করিয়া বেড়ান, আবার যেখানে তিনি দুই বণিকপুত্র ত্রপুষ ও ভল্লিকের হস্ত হইতে উপোষণান্তে মধুপিষ্টকপূর্ণ পিণ্ডপাত্র গ্রহণ করেন, এই সকল স্থান ও অন্যান্য অনেক বিষয় হুয়েন সাং তাঁহার গ্রন্থে বর্ণন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, ত্রপুষ এবং ভল্লিক বুদ্ধের দুই প্রথম গৃহস্থ শিষ্যরূপে তাঁহার 'ধর্ম্মে' দীক্ষিত হন—'সঙ্ঘ' তখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। বুদ্ধ-গয়ায় বুদ্ধের এইরূপ কত কত কীর্ত্তি-চিহ্ন রহিয়াছে তাহার অন্ত নাই।

সারনাথ।—

ইহা কাশী সমীপস্থ বৌদ্ধতীর্থ; এই স্থান হইতে বুদ্ধদেব তাঁহার ধর্ম্মচক্র প্রথম প্রবর্ত্তিত করেন। সারনাথ বৌদ্ধসম্প্রদায়ের একটী প্রধান স্থান ছিল। বুদ্ধ বর্ত্তবান থাকিতেই সারনাথ বিহার প্রস্তুত হয়। তথায় বৌদ্ধদের অনেক দেবালয় ও দেব মূর্ত্তি এবং উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় ছিল। এই সারনাথ একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার চারিদিকে এরূপ প্রভূত ভস্মরাশি বিদ্যমান আছে যে, দেখিয়া বোধ হয় বৌদ্ধদ্বেষী শত্রুপক্ষীয়েরা সমুদায় ভস্মীভূত করিয়াছে। এই ক্ষেত্রে অশোকের সময়ে একটী স্তূপ নির্ম্মিত হয়; এখনও সে স্তূপ রহিয়াছে এবং তাহা হুয়েন সাং দেখিয়াছিলেন। এই স্তূপের অনতিদূরে কনিঙ্হাম সাহেব একটী প্রস্তরখণ্ড আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধের জন্ম, বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি, কাশীতে উপদেশ ও নির্ব্বাণ, এই চারি ঘটনাসম্বন্ধীয় প্রতিমূর্ত্তি সকল খোদিত আছে।

রাজগৃহ।—

বিম্বিসারের রাজধানী। বুদ্ধ কপিলবস্তু হইতে নিষ্ক্রমণ করিয়া এখানে দুইজন ব্রাহ্মণ আলাড় কালাম এবং রুদ্রকের নিকট প্রথমে ধর্ম্মোপদেশ গ্রহণ করেন।—যদিও তাহাদের প্রদর্শিত পথ তাঁহার মনোনীত হয় নাই, তথাপি তাহাদের শিক্ষা ও উপদেশ একেবারেই নিরর্থক হইয়াছিল বলা যায় না, সে শিক্ষার ফল ভবিষ্যতে তাঁহার নিজের উপদেশে ফলিত দেখা যায়। রাজগৃহের বেণুবন ও গৃধ্রকূট পর্ব্বত বুদ্ধদেবের প্রিয় আবাসস্থান ছিল। বুদ্ধের জীবনী সংক্রান্ত আরও অনেক ঘটনা এই স্থানে সংঘটিত হয়। সারীপুত্র ও মুদ্গলায়ন, গৌতমের দুই প্রধান শিষ্যের অশ্বজিতের সঙ্গে এখানেই প্রথম আলাপ পরিচয়। গুরুর বিরুদ্ধে দেবদত্তের ষড়যন্ত্রেরও এই স্থান। ইহার নিকটেই সপ্তপর্ণী গুহা, যেখানে বৌদ্ধ সভার প্রথম অধিবেশন হয়। বুদ্ধের শেষ বয়সে, যখন তিনি বেণুবনের বিহার হইতে রাজগৃহের গৃধ্রকূটে ফিরিয়া যান, তখন রাজা অজাতশত্রু বৃজিজাতীয় লোকদিগকে আক্রমণের পন্থা দেখিতে-ছিলেন। ঐ জাতি গঙ্গার উত্তর পাড় মগধের সামনে বাস করিত। অনায়াসে বৃজি জাতির সমুচ্ছেদ সাধন করিতে পারিবেন কি না, তাহা জানিবার জন্য অজাতশত্রু স্বীয় অমাত্য বর্ষকারকে বুদ্ধদেবের নিকট প্রেরণ করেন। গৌতম বলিয়া-ছিলেন যতদিন বৃজিগণ পরস্পর ঐক্য বন্ধনে বদ্ধ থাকিবে, যতদিন উহারা মিলিত হইয়া কার্য্য করিবে, স্বধর্ম্ম পালনে রত থাকিবে, যতদিন উহাদের মধ্যে কুলস্ত্রী ও কুলকুমারীগণ পূজিত

হইবেন, যতদিন উহারা অর্হৎগণের রক্ষা ও পালন করিবে, ততদিন বৃজি জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট হইবে না। ঐ প্রসঙ্গে তাঁহার ভিক্ষু সঙ্ঘ যাহাতে ধর্ম্মের আশ্রয়ে ঐক্যসূত্রে মিলিত হয়, তাহাদের পরস্পরের মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন না হয়, তদ্বিষয়ক উপদেশ প্রদান করেন।

পাটলীপুত্র।—

গুরুজী গঙ্গাপার হইবার সময় দেখিলেন—অজাতশত্রু পাটলীপুত্রের ঠিকানায় বৃজিদের আক্রমণ নিরোধ উদ্দেশে এক দুর্গ নির্ম্মাণ করিতেছেন। সেই সময়ে তিনি পাটলীপুত্রের ভাবি গৌরব ও শ্রীবৃদ্ধির কথায় সকলকে আশ্বাসিত করিয়া তাহার ভাবি দুর্গতির কারণও নির্দ্দেশ করিলেন। "নগরের তিন শত্রু, অগ্নি, জল ও গৃহ-বিচ্ছেদ।" এই ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রীত হইয়া, যে দ্বার দিয়া গৌতম গঙ্গাবতরণ করেন, নগরাধ্যক্ষ তাহার নাম 'গৌতম-দ্বার' রাখিবার আদেশ করিলেন। রাজ-গৃহের পর পাটলীপুত্রই মগধের রাজধানী হইল—অশোকের রাজধানী তাহাই। এই নগরীর আধুনিক নাম পাটনা।

কোশল।—

কোশলের রাজা প্রসেনজিৎ বুদ্ধদেবের একজন ভক্ত ছিলেন। একদা তিনি বুদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। রাজা তাঁহার চরণ বন্দনা করিয়া কহিলেন,—"ভগবন্! আপনার সদৃশ সদ্গুরু আমি কখনো দর্শন করি নাই। বিষয়াসক্তিই পৃথিবীতে যত অশান্তির কারণ। লোকেরা তথাগতের ধর্ম্ম আশ্রয় না করিলে তাহাদের কল্যাণ হইবে না।"

প্রসেনজিতের ভগিনীর সহিত মগধরাজ বিম্বিসারের বিবাহ হয়। বিম্বিসার যৌতুক স্বরূপ শ্রাবস্তী রাজ্য প্রাপ্ত হন। তিনি অজাতশত্রু কর্ত্তৃক নিহত হইলে, প্রসেনজিৎ শ্রাবস্তী ফিরিয়া লয়েন। এই সূত্রে অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎ, এই দুই রাজার যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কালে প্রসেনজিৎ পথিমধ্যে কোন উদ্যান-পালিকা মালিনীকে দেখিতে পান। উহার নাম মল্লিকা। মল্লিকার রূপগুণে আকৃষ্ট হইয়া রাজা তাহাকে বিবাহ করেন।

কথিত আছে এই ঘটনার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বুদ্ধ পাঁচশত ভিক্ষু সহ শ্রাবস্তীতে গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এই বালিকা বুদ্ধকে একখানি সুমিষ্ট পিষ্টক ভিক্ষা স্বরূপ দান করিয়াছিল—তাহাতে বুদ্ধদেব সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে আশীর্ব্বাদ করেন। সেই পুণ্যফলে বালিকাটি ভবিষ্যতে কোশলের রাজমহিষী পদে অধিরূঢ় হয়। মল্লিকার গর্ব্ভে বিরুধক নামে এক পুত্র জন্মে।

প্রসেনজিতের ইচ্ছা এই যে, বুদ্ধবংশের সহিত তাঁহার বিবাহ-সম্বন্ধ নিবদ্ধ হয়, এবং কোন এক শাক্য-কন্যার পাণি-গ্রহণের অভিলাষী হইয়া তিনি বিবাহের প্রস্তাব করিয়া পাঠান, কিন্তু শাক্যেরা এ বিবাহে সম্মতি প্রদান করে নাই। তাহাদের মতে কোশলরাজ জাতিকুল হিসাবে শাক্যদের সমকক্ষ নহে। পরিশেষে তাহাদের কোন এক শ্রেষ্ঠীর বাসবক্ষত্রিয়া নামে এক দাসীপুত্রীর সহিত কোশলরাজের বিবাহ সংঘটন হয়।

বিরুধক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া বুঝিতে পারিলেন যে, শাক্যেরা তাঁহার পিতাকে দাসীপুত্রীর সহিত বিবাহ দিয়া তাঁহাকে

কিরূপ প্রতারণা করিয়াছে, এবং কিসে শাক্যদের দর্প চূর্ণ হয়, তাহার পন্থা ভাবিতে লাগিলেন। সিংহাসন প্রাপ্তির অনতি-কাল বিলম্বে (পূর্ব্বে যেমন বলা হইয়াছে) তিনি শাক্যরাজ্য আক্রমণ করিয়া, তাহাদের নগর ভূমিসাৎ এবং শাক্যবংশ সমূলে ধ্বংস করেন, ও সহস্র সহস্র দাসী-কন্যা বন্দী করিয়া লইয়া যান।

মহাবংশ টীকায় এইরূপ কথিত আছে যে, বুদ্ধের জীবদ্দশায় কতকগুলি শাক্য বিরুধকের অত্যাচার ভয়ে হিমালয়ে পলায়ন করিয়া ঐ প্রদেশে একটী সুন্দর নগর পত্তন করে, তাহার নাম মোরিয় নগর (মৌর্য্য নগর)। সেই স্থান অনেকানেক ময়ূরের কেকা রবে প্রতিধ্বনিত বলিয়া ঐ নাম রাখা হয়। বৌদ্ধদের বিশ্বাস এই যে, অশোক রাজা বুদ্ধবংশ-সম্ভূত, কেননা অশোকের পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য নগরের কোন এক রাণীর পুত্র বলিয়া প্রখ্যাত।*

শ্রাবস্তী।—

রাজগৃহে দ্বিতীয় বর্ষা যাপন করিয়া বণিক অনাথপিণ্ডদের আমন্ত্রণে বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী গমন করেন। ইহা কাশীর উত্তর পশ্চিম রাপ্তী নদীতীরস্থিত। গৌতমের সময় ইহা কোশল-রাজ প্রসেনজিতের রাজধানী ছিল। শ্রাবস্তীর জেতবন উদ্যান অনাথপিণ্ডদের বহুমূল্য দান; যত স্বর্ণ-মুদ্রা সেই ভূমিখণ্ডের

---

* Kshatriya Clans in Buddhist India
(The Sakyas)
By Bimala Charan Law, M.A.B.L., F.R.H.S.—London.

উপর বিছাইয়া ঢাকিয়া দেওয়া যায়, বণিক তাহা তত মুদ্রায় ক্রয় করিয়া বৌদ্ধ সঙ্ঘে উপহার দেন। জেতবন বুদ্ধদেবের সাধের আশ্রম ছিল; সেখান হইতে তিনি যে সকল উপদেশ দেন তাহা বৌদ্ধ শাস্ত্রে প্রখ্যাত। জেতবনে যে বিহার নির্ম্মিত হয়, হুয়েন সাং তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিয়া যান। ফাহিয়ান বলেন শ্রাবস্তিতে প্রসেনজিৎ বুদ্ধের এক চন্দনকাষ্ঠের বৃহৎ প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করেন। ওখানকার এক মন্দির খনন করিতে করিতে বুদ্ধের এক বড় প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া যায়, কিন্তু কাষ্ঠ মুর্ত্তির কোন চিহ্ন দেখা যায় নাই।

বৈশালী।—

লিচ্ছবি—বৃজী-জাতীয় লোকদের রাজধানী। সজন, সধন নগর বলিয়া বৌদ্ধ যুগে প্রখ্যাত। প্রবজ্যা গ্রহণের প্রথম কতিপয় বৎসর ইহা বুদ্ধদেবের বিহারভূমি ছিল। এই নগরীর কূটাগার শালা, অম্বপালীর আম্রবন, মহাবন প্রভৃতি স্থান হইতে তিনি অনেক সময় উপদেশ দিতেন। তিনি বৃজি-জাতীয় নাগরিকদের আচারব্যবহারে অত্যন্ত প্রীত হইয়াছিলেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার দয়াদাক্ষিণ্য যথেষ্ট ছিল। রাজা অজাতশত্রু তাহাদিগকে উচ্ছেদ করিবার অভিপ্রায়ে যখন বুদ্ধের পরামর্শ চাহিতে তাঁহার নিকট দূত পাঠাইয়াছিলেন, তখন তিনি বৃজী-জাতি সম্বন্ধে নিজের যা মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রসিদ্ধই আছে। যাহাতে এই নিরীহ জাতির স্বাধীনতা বিনষ্ট না হয়, তাঁহার মনোগত

অভিপ্রায় তাহাই ছিল, এ কথা তাঁহার উত্তরের ভাবার্থে স্পষ্টই বোঝা যায়।

যখন বুদ্ধের পৃথিবীর দিন ফুরাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি ঐ নগরের প্রতি শেষবারের মত কি করুণভাবে দৃষ্টি-পাত করিয়াছিলেন, তাহা মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্রে বর্ণিত আছে। ঐ অঞ্চলে তাঁহার শেষ ভ্রমণকালে যখন বৈশালী ছাড়িয়া যান,—সেই নগর যাহার সহিত তাঁহার কতই সুখের স্মৃতি জড়িত—কথিত আছে তাহার প্রতি তিনি হস্তীর ন্যায় ফিরিয়া তাকাইয়া দেখিলেন, এবং আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "আনন্দ, শেষবারের মত এই বৈশালী দেখিয়া লইলাম—আর আমার দেখা ঘটিবে না"।

বুদ্ধদেবের পরিনির্ব্বাণের পর, এই বৈশালীতে বৌদ্ধ সঙ্ঘের মহাসভার অধিবেশন হয়, তাহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের আচারবিচার সম্বন্ধে সঙ্ঘে যে মতভেদ হইয়াছিল, সেই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ, বিচার ও নিষ্পত্তি হয়। সঙ্ঘ দুই দলে বিভক্ত হইয়াছিল; এক দল বুদ্ধস্থাপিত প্রাচীন কঠোর নিয়মের পক্ষপাতী, অন্য দল সেই নিয়মের শৈথিল্য সাধনে সমুৎসুক। তাঁহারা একাহার নিয়মের পরিবর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হয়েন। তাঁহারা চাহেন মধ্যাহ্ন ভোজনের পর অপরাহ্নেও তাঁহারা ইচ্ছামত পক্কান্ন ভোজন করিতে পারিবেন; ভিক্ষুদের স্বর্ণরৌপ্য গ্রহণ-নিষেধ ঘুচিয়া গিয়া সে বিষয়ে তাঁহাদের স্বেচ্ছানুরূপ চলিবার নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, ইত্যাদি। ইহা বৈশালীর দ্বিতীয় সভা, এই সভায় আমোদ-

প্রিয় সভ্যদিগের পরাভব হয়, কঠোর ব্রতধারী ভিক্ষুগণ জয় লাভ করেন।

কপিলবস্তু হইতে ফিরিয়া আসিয়া, একদা বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনস্থ কূটাগার শালায় বাস করিতেছিলেন, এমন সময় মহাপ্রজাপতি কতিপয় শাক্য মহিলা সমভিব্যাহারে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া, ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ স্থাপনের প্রস্তাব করেন। বুদ্ধ প্রথমে অসম্মতি প্রকাশ করেন—তাঁহার আশঙ্কা এই, ভিক্ষুণীরা সঙ্ঘে প্রবেশ করিলে তাঁহার ধর্ম্ম দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না, শীঘ্রই লোপ পাইবে। পরে আনন্দের বহু সাধ্য সাধনায়, বিশেষ বিবেচনার পর তিনি প্রজাপতির মনস্কামনা পূর্ণ করিলেন।

বুদ্ধের মৃত্যুর পর তাঁহার দেহের ভস্মাবশেষের উপর, লিচ্ছবিরা এই স্থানে একটি স্তূপ নির্ম্মাণ করে। বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ঐ সকল প্রদেশের সম্যক অভিজ্ঞ, জেনারেল কানিংহাম্ সাহেব বিস্তর গবেষণার পর ত্রিহুত প্রদেশে মজঃফরপুরের বসাড় গ্রাম বৈশালীর বাস্তুভূমি বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন।

কৌশাম্বী —

আলাহাবাদ হইতে ১৫ ক্রোশ দূর। ইহা এক প্রাচীন নগরী, রামায়ণেও ইহার উল্লেখ আছে। ইহা সেই রাজা উদয়নের স্থান, যাঁহার নাম মেঘদূতের এক শ্লোকে কীর্ত্তিত আছে :—'উদয়ন কথাকোবিদ গ্রামবৃদ্ধান্'।

রত্নাবলী নাটকের রঙ্গভূমিও এই। বুদ্ধ এখানে অনেক সময় আসিয়া উপদেশ দিতেন। কথিত আছে বুদ্ধের এক চন্দনকাষ্ঠের প্রতিমূর্ত্তি শ্রাবস্তীতে যেমন, এখানেও তেমনি গঠিত হয়। এটি বুদ্ধের জীবদ্দশাতেই নির্ম্মিত হইয়াছিল। যে স্থপতি ইহা নির্ম্মাণ করে, তাহাকে ত্রয়স্ত্রিংশ স্বর্গে পাঠান' হয়, সেখানে গিয়া সে বুদ্ধদেবের দর্শন পায়, তথায় তিনি তাঁহার মাতা মায়াদেবীকে ধর্ম্মোপদেশ দিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন।

নালন্দ।—

নালন্দ বিহার বৌদ্ধদের একটী অত্যুৎকৃষ্ট বিশ্ব-বিদ্যালয়। ইহার আধুনিক স্থান বারাগাঁও, বুদ্ধগয়া হইতে ৪০ মাইল দূর। হুয়েন সাং বলেন বুদ্ধ এখানে ৩ মাস অবস্থিতি করিয়া ধর্ম্মোপদেশ করেন। হুয়েন সাং নিজে এই বিহারে ৫ বৎসর কাল থাকিয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। শিলাদিত্যের রাজত্ব কালে নালন্দ-বিহার পূর্ণ মহিমায় বিরাজিত ছিল; রাজকোষ হইতে ইহার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত। হুয়েন সাঙের বর্ণনা এই— "ছয়টী ভিন্ন ভিন্ন বিহারে প্রায় ১০,০০০ ভিক্ষু অধ্যয়নে নিযুক্ত—বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের অষ্টাদশ শাখা এখানে একত্রিত। এখানকার ছাত্রেরা সকলেই প্রখর-বুদ্ধি, সুপণ্ডিত ও পবিত্র চরিত্র। সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ও ধর্ম্মালাপ; দূর দূর হইতে মহা মহা পণ্ডিত তাঁহাদের ধর্ম্মবিষয়ক সন্দেহ ভঞ্জন করিতে আসিয়া থাকেন। ত্রিপিটক যাহাদের কণ্ঠস্থ নাই, তাহারা লজ্জায় মুখ হেঁট করিয়া থাকে। নালন্দ-

ছাত্রদের পাণ্ডিত্যের এমনি খ্যাতি যে, অনেকানেক ভণ্ড তপস্বী তাহাদের উপাধি ধারণ করিয়া পাণ্ডিত্যের ভাণ করিয়া বেড়ান।”

পাবা ও কুশীনগর।—

বুদ্ধের সময় বৃজী-জাতির ন্যায় স্বাধীন রাজতন্ত্রসম্পন্ন, মল্ল নামক আর এক জাতি উল্লেখযোগ্য। পাবা ও কুশীনগর, মল্লদের এই দুই প্রধান নগর। বুদ্ধদেব তাঁহার শেষ জীবনে, মল্ল রাজ্যে চুন্দ নামে কর্ম্মকারের আম্রবনে গিয়া উপনীত হয়েন, পরে চুন্দের নিমন্ত্রণে তাঁহার গৃহে বিবিধ খাদ্যদ্রব্য সহ বরাহ মাংস ভোজন করিয়া, রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। সেই পীড়িত অবস্থায়, তিনি সেই স্থান হইতে কুশীনগর যাত্রা করেন। সেখানে আপনার আসন্ন মৃত্যু প্রতীক্ষা করিয়া, নগরের প্রান্তে শালবনে গিয়া বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, “আনন্দ, তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে তথাগত এই স্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।” তাঁহার পরিনির্ব্বাণের পর, আনন্দ সেই সংবাদ মল্লদের নিকট লইয়া যায়। মল্লগণ আনন্দের মুখে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া, শোকাভিভূত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। অনন্তর উহারা নগরপ্রান্তে শালবনে গমন করিয়া নৃত্য গীত বাদ্য ও পুষ্পমাল্যের দ্বারা, ক্রমান্বয় সাতদিন বুদ্ধ দেহ পূজা করিল। পরে ঐ দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থানান্তরিত করিয়া রাজচক্রবর্ত্তীযোগ্য অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া সম্পন্ন

করিল। চিতানল নির্ব্বাপিত হইলে, তাঁহার অস্থিখণ্ডসকল একত্র করিয়া, তাহাদের রক্ষাগারে সুরক্ষিত করিয়া রাখিল।

পাবার মল্লেরাও তাঁহার দেহাংশের অংশভাগী। শুধু তাহা নয়, মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলবস্তুর শাক্যগণ, ইহাঁরা সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশ প্রার্থনা করিলেন; ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়—এই বলিয়া এক এক অংশের দাবী করিতে লাগিলেন। কুশীনগরের মল্লেরা প্রথমে তাঁহাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। পরিশেষে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ধার্য্য হইল যে, বুদ্ধদেহ অষ্টমাংশে বিভক্ত হউক, ও তাহাতে যাহাদের ন্যায্য অধিকার, তাহাদের এক এক অংশ বিতরণ করা হউক—এইরূপে দেহের অষ্টাংশের উপর অষ্ট স্তূপ নির্ম্মিত হইল।* পাবা ও কুশীনগরের মল্লেরাও বুদ্ধদেহাংশের উপর স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া প্রীতিভোজনান্তে এই শুভানুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিল।

ভিক্ষুগণ উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—

দেবিন্দ নাগিন্দ নরিন্দ পূজিতো
মনুস্সিন্দ-সেট্‌ঠেহি তথৈব পূজিতো
তং বন্দথ পঞ্জলিকা ভবিত্বা
বুদ্ধো হবে কপ্পসতে হি দুল্লভো তি।

---

* অষ্ট স্তূপ।

১। রাজগৃহ।	৫। রামগ্রাম।
২। বৈশালী।	৬। বেষ্টদীপ।
৩। কপিলবস্তু।	৭। পাবা।
৪। অল্লকপ্প।	৮। কুশীনগর।

দেবেন্দ্র নাগেন্দ্র নরেন্দ্র পূজিত,
মনুজেন্দ্র-শ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদেরও সেবিত,
কৃতাঞ্জলিপুটে সবে করহ বন্দন,
শতকল্পে সুদুর্লভ বুদ্ধের জনম।

চীন পরিব্রাজকেরা এখানকার ভগ্নাবস্থা দেখিয়া যান। এই প্রসঙ্গে হুয়েন সাং বলেন, বুদ্ধের মৃত্যুসংবাদ শ্রবণ করিয়া কাশ্যপ কুশীনগর যাত্রা করিতেছেন, এমন সময় কতকগুলি ভিক্ষু আনন্দ-প্রকাশ করিয়া বলিয়া উঠিল "তথাগত গেলেন, বাঁচা গেল! আমরা কেহ কোন দোষ করিলে এখন কে আমাদের শাসন করিবেন?" এই কথা শুনিয়া কাশ্যপ ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলকে ডাকিয়া বলিলেন "আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র বাঁধিয়া দেওয়া আবশ্যক। যে-সকল ভিক্ষু বুদ্ধের বিধানসমুদয় ভালরূপ জানেন, যাঁহারা নিজে সেই ধর্ম্মে অনুরক্ত, যাঁহারা অধীত ও সুবিচারী, তাঁহারা সভা করুন,—অপ্রবীণ নূতন শিষ্যেরা চলিয়া যান"।

ইহা শুনিয়া অনেকে চলিয়া গেল; ১০০০ লোক অবশিষ্ট রহিলেন—তাঁহাদের মধ্যে আনন্দ একজন। কাশ্যপ আনন্দকে গ্রহণ করিতেও সম্মত হইলেন না। তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—"তোমাকে সম্পূর্ণ দোষশূন্য বলিতে পারি না। তুমিও এ সভার যোগ্য নও। তুমি বুদ্ধের পার্শ্ব-সহচর প্রিয় শিষ্য ছিলে, তাঁহাকে পিতার ন্যায় ভক্তি করিতে ও ভালবাসিতে, তুমি এখনো সম্পূর্ণ আসক্তিবিহীন হইতে পার নাই—এই আমার ধারণা।"

আনন্দ নির্জ্জন অরণ্যে গিয়া যোগসাধন দ্বারা অর্হৎ-সিদ্ধি লাভ করিলেন। পরে যখন তিনি সভাস্থলে ফিরিয়া দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইলেন, কাশ্যপ তাঁহাকে বলিলেন "তুমি আসক্তি-শূন্য হইয়াছ, তাহার প্রমাণ দেখাও। তুমি সূক্ষ্ম শরীরে এই রুদ্ধ দ্বার দিয়া সভায় প্রবেশ করিতে পারিলে বুঝা যাইবে।" আনন্দ তখনি দ্বারের ছিদ্র দিয়া সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করিলেন এবং উপস্থিত স্থবিরদিগকে প্রণাম করত সভা মধ্যে উপবিষ্ট হইলেন।

এই ত ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ তীর্থের কথা বলা হইল। ইহা ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, তিব্বত প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের স্মরণচিহ্নসকল বিক্ষিপ্ত—এই স্থলে তাহাদের বিবরণ দিবার প্রয়োজন নাই।

প্রায়শ্চিত্ত বিধান।—

খৃষ্টীয় ক্যাথলিকদের মধ্যে গুরু সন্নিধানে আত্মপাপ স্বীকার করিবার যে রীতি আছে, বৌদ্ধ সমাজে তাহার অনুরূপ একটী প্রথা প্রচলিত ছিল। প্রত্যেক ভিক্ষুকে প্রতিমাসে দুইবার, অর্থাৎ পূর্ণিমা ও অমাবস্যার দিনে উপবাস পর্ব্বে প্রাতিমোক্ষের বিধানানুসারে সঙ্ঘসন্নিধানে আত্মপাপ অঙ্গীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে হইত। দর্শপূর্ণমাসী বৈদিক বিধির অনুকরণে সম্ভবতঃ বৌদ্ধদের মধ্যে এই পাক্ষিক পর্ব্ব প্রবর্ত্তিত হয়। যেখানে এই পাক্ষিক সভার অধিবেশন হইত, সেখানে সেই ভাগের যত ভিক্ষুদল সকলকেই উপস্থিত হইতে হইত। ভিক্ষু সঙ্ঘ সমবেত হইলে, পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিধানের মন্ত্র পাঠ করিয়া সভার কার্য্য আরম্ভ হইত।

"ভিক্ষুদের মধ্যে যিনি যে-কোন পাপ করিয়াছেন, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করুন; যদি কোন দোষ না করিয়া থাকেন, চুপ করিয়া থাকুন। যিনি মৌন থাকিবেন, ধরা যাইবে তিনি নিরপরাধী। যিনি পাপ করিয়া, জানিয়া শুনিয়া অস্বীকার করেন, তিনি মিথ্যাবাদী। ভগবান বুদ্ধ বলিয়া গিয়াছেন মিথ্যাই বিনাশের মূল। অতএব যদি কোন ভিক্ষু কোন বিষয়ে অপরাধ করিয়া থাকেন, ও তাহা হইতে মুক্তি লাভের ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা প্রকাশ্যে অঙ্গীকার করুন; অনুতাপে পাপভার লঘু হইয়া যায়।"

প্রাতিমোক্ষ নামক গ্রন্থে প্রায়শ্চিত্ত বিধানগুলি সন্নিবেশিত হইয়াছে। কথিত আছে যে, বুদ্ধদেব প্রথম কাশী হইতে রাজগৃহে প্রবাস কালে এই সমস্ত প্রায়শ্চিত্ত বিধান বিধিবদ্ধ করেন। ভিক্ষু সঙ্ঘের পাক্ষিক অধিবেশনে এই প্রাতিমোক্ষের নিয়ম সকলের আবৃত্তি ও ব্যাখ্যান হইত। কোন্ অপরাধের কি দণ্ড, প্রায়শ্চিত্তই বা কিরূপ, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইত। অপরাধ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত। * নরহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি কতক-

---

*অপরাধের শ্রেণী বিভাগ।

১। পারাজিক—
ব্যভিচার, অদত্ত বস্তু গ্রহণ, জ্ঞানপূর্ব্বক নরহত্যা, অলৌকিক ক্ষমতার বৃথা গর্ব্ব।

২। সঙ্ঘাতিদেশ—
ব্রহ্মচর্য্য হানি, দূষিত অন্তঃকরণে স্ত্রীলোকের হস্ত ধারণ, দুর্ভাষণ ইত্যাদি ১৩ প্রকার অপরাধ।

৩। অনিয়ত—
ব্যভিচার দুই প্রকার।

গুলি গুরুপাপের দণ্ড সঙ্ঘ হইতে বহিষ্কার। অপেক্ষাকৃত লঘু পাপ—যথা, দূষিতভাবে রমণীর অঙ্গ স্পর্শ, কোন ভিক্ষুর প্রতি অন্যায় ব্যবহার,—তাহার বিশেষ বিশেষ প্রায়শ্চিত্ত নির্দ্দিষ্ট আছে। পরে আহার বিহার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে অনিয়ম, মিথ্যা কথা, অতিলোভ, পরনিন্দা, ভিক্ষুণীর সঙ্গে একাকী ভ্রমণ,—এই সমস্ত ছোটখাট দোষ 'দুকত' (দুষ্কৃত) বলিয়া গণ্য, অনুতপ্ত হৃদয়ে অঙ্গীকারেই ইহাদের খণ্ডন। এই সকল ছোট-খাট দুষ্কৃতের স্বরূপ ও বিধান দেখিলে বোঝা যায় ভিক্ষু সঙ্ঘ কি কঠোর ধর্ম্মশাসনে নিয়ন্ত্রিত ছিল! কোন কুটীর নির্ম্মাণ করিতে হইলে তাহার কি মাপ হইবে, ছাতা দর্পণ ব্যবহার্য্য কি না, দাস্তনের মাপ কি, ভিক্ষা পাত্র কিরূপ, বসিবার আসন

৪। নিসগীয় প্রায়শ্চিত্তীয়—
আহার, পরিচ্ছদ, শয্যা, ভিক্ষাপাত্র, স্বর্ণ রৌপ্য গ্রহণ সম্বন্ধীয় ৩০টি অপরাধ।

৫। প্রায়শ্চিত্তীয়—
মিথ্যা কথা, পিশুন বাক্য, নিন্দা, বাগবিতণ্ডা, প্রতারণা, অত্যাচার, ভিক্ষু ভিক্ষুণীর পরস্পর দুর্ব্যবহার, অসময়ে ভিক্ষা, ভোজন বিষয়ে অনিয়ম, সুরাপান, অকারণে অগ্নিসেবা, জ্ঞানপূর্ব্বক প্রাণীহত্যা, বহিষ্কৃত শ্রমণের সহিত একত্রে আহার শয়ন, ভিক্ষুগণের পরস্পর ব্যবহার, অন্যায়পূর্ব্বক সঙ্ঘের সম্পত্তি ভোগ, শয্যা বা পর্য্যঙ্কে তুলা দ্বারা কোমল বিছানায় শয়ন, প্রভৃতি ৯২ প্রকার অপরাধ।

৬। প্রতিদেশনীয়—
ভিক্ষুণীর হস্ত হইতে আহার গ্রহণ, নিমন্ত্রিত না হইয়া কোন গৃহস্থের বাড়ী যাইয়া খাদ্যদ্রব্য বা পানীয় গ্রহণ, ইত্যাদি চারিটি লঘু অপরাধে দোষ স্বীকারে প্রায়শ্চিত্ত।

৭। কতকগুলি শিক্ষনীয় ধর্ম্ম—

কত বৎসর চালাইতে হইবে, হাঁচিলে 'দীর্ঘজীবি হও' বলিয়া আশীর্ব্বাদ করা বিধেয় কিনা, কি উপায়ে 'আরাম' বিহার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে, কিরূপে স্নান আহার করিবে—ওঠা বসা ভোজন শয়ন নিদ্রা, জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য বুদ্ধদেব নিয়ম বাঁধিয়া দিয়াছেন। বুদ্ধের উপদেশ কোন্ ভাষায় প্রচারিত হওয়া উচিত, এই লইয়া অনেক সময় কথা উঠিত। একবার দুই জন ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট প্রস্তাব করিলেন, "প্রভু, আপনার উপদেশ চলিত ভাষায় লোকের মুখে মুখে অশুদ্ধ ও নষ্ট হইয়া যায়, আমাদের ইচ্ছা বুদ্ধের উপদেশগুলি সংস্কৃত ছন্দে রচিত হইয়া প্রচারিত হয়।" বুদ্ধ তাহাতে সম্মত হইলেন না। তিনি কহিলেন, "এরূপ হইলে ধর্ম্মপ্রচারের সাহায্য হইবে না, বরং তাহার উল্টা হইবে। লোকেদের অবোধ্য দুরূহ ভাষায় ধর্ম্ম প্রচারের ব্যাঘাত জন্মিবে। ভিক্ষুগণ! তোমরা প্রত্যেকে নিজ নিজ মাতৃ-ভাষায় বুদ্ধ-বচন গ্রহণ কর, এই আমার উপদেশ।" (চুল্লবগ্‌গ)

এই সমস্ত নিয়মাবলীর পাঠ ও আবৃত্তি সমাপ্ত হইলে পাঠক নিবেদন করেন—"ভগবান বুদ্ধের বিধানানুসারে পাঠাবৃত্তি সমাপ্ত হইল, তোমরা সকলে শান্তসমাহিত চিত্তে, সদ্ভাবে নির্ব্বিবাদে ইহার মর্ম্ম গ্রহণ কর।"

পঞ্চায়ৎ।—

কিন্তু এই সদুপদেশ সত্ত্বেও সঙ্ঘে অনেক সময় বাদানুবাদ ও মতভেদ উপস্থিত হইত; চুল্লবগ্‌গে সমস্ত বিবাদভঞ্জনের অনেক প্রকার নিয়ম পরিকল্পিত দেখা যায়। তাহার মধ্যে

বিবাদ মীমাংসার জন্য পঞ্চায়তের ব্যবস্থা উল্লেখযোগ্য। প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়া পঞ্চায়তে সমর্পিত হইলে, অধিকাংশ লোকের মতে তাহার নিষ্পত্তি হইত। যে সকল ভিক্ষু পঞ্চায়তে নিযুক্ত হইবেন, তাঁহাদের কতকগুলি গুণ থাকা আবশ্যক। অপক্ষপাতী, রাগদ্বেষভয়শূন্য, বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুরাই এই পঞ্চায়তে বিচার করিতেন। মত গ্রহণের তিন প্রকার রীতি ছিল—গুপ্ত, অপ্রকাশ্য, প্রকাশ্য। যখন নিঃসংশয়ে জানা যায় যে, কোন একটী বিষয় সাধারণ মতে ধর্ম্মনিয়মের অনুবর্ত্তী, তখন আর গুপ্তমত গ্রহণের আবশ্যক নাই, প্রকাশ্য ভাবে গ্রহণ করিলেই হইল। তর্ক বা সন্দেহস্থলে মত-গ্রাহক ভিক্ষু দুই রঙের টিকিট প্রস্তুত করিবেন, ও যিনি মত দিতে আসিবেন তাঁহাকে বলিবেন "এই মতের লোকের জন্য এই টিকিট ; অন্য মতের লোকের জন্য এই অন্য টিকিট ; যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। অন্য কাহাকেও দেখাইও না।" বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন যে, ধর্ম্মবিরুদ্ধ পক্ষের মত বলবত্তর, তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন। আর ধর্ম্মের অনুযায়ী স্থির হইলে, সে মত গ্রাহ্য করিবেন। মত গ্রহণের এই গুপ্তরীতি (ব্যালট)। অপ্রকাশ্য রীতি হচ্ছে ভিক্ষুর কানে কানে বলা, "এই টিকিট এই মতের পোষক, এই অন্য টিকিট অন্য মতের পোষক—যেটা ইচ্ছা গ্রহণ কর। তুমি কোন্ মতে মত দিবে আর কাহাকেও বলিও না।" বিজ্ঞাপক যদি বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করেন যে ধর্ম্মবিরোধী মত বলবত্তর, তাহা হইলে সে মত অগ্রাহ্য করিবেন ; অধিকাংশের মত ধর্ম্মের অনুযায়ী স্থির

জানিলে, সে মত গ্রাহ্য করিবেন। অপ্রকাশ্য ভাবে মত গ্রহণের এই নিয়ম। (চুল্লবগ্‌গ)

বর্ষার ৩ মাস ভিক্ষুদের সম্মিলন ও উৎসবের সময়। বিহার ও অন্যান্য আশ্রমে তাঁহারা এই উৎসবের মাসত্রয় যাপন করিতেন; তখন ধর্ম্মালাপ, শাস্ত্রালোচনা, আবৃত্তি প্রভৃতির ধূম লাগিয়া যাইত। শ্রাবকেরা দেশদেশান্তর হইতে আসিয়া বুদ্ধের জাতক উপাখ্যান শ্রবণের পুণ্যার্জন করিতেন, এবং সকলে সদ্ভাবে মিলিত হইয়া উৎসবে যোগদান করিতেন। আমার স্মরণ হয়, যখন বোম্বায়ে আমার সার্ভিসের প্রথম ভাগে আহমদাবাদে কর্ম্ম করিতাম, তখন অনেক সময় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া ঐরূপ বর্ষার উৎসবে উপস্থিত হইতাম। উহা জৈনোৎসব, বৌদ্ধদের উৎসব নহে, কিন্তু অনেক বিষয়ে এই উভয়ের সাদৃশ্য আছে। আহমদাবাদও অঞ্চলের জৈন সম্প্রদায়ের প্রধান স্থান। চাতুর্মাস্য যাপন, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ ও শ্রবণ, উপবাস ব্রত ধারণ প্রভৃতি বৌদ্ধ রীতি অনুসারে জৈনদের মধ্যেও বর্ষার উৎসব ক্রিয়া সম্পন্ন হইত।

বর্ষোৎসবের শেষে এবং প্রব্রজনের আরম্ভে বৌদ্ধদের এক বার্ষিক সভা হইত, তাহার নাম 'প্রবারণ' অর্থাৎ আমন্ত্রণ। এই আমন্ত্রণে ভিক্ষুদল মিলিত হইলে উল্লিখিত প্রকার পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত বিষয়ক কথাবার্ত্তা চলিত। যিনি প্রায়শ্চিত্ত-প্রার্থী, তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া বলিতেন—

"হে ভিক্ষুগণ! আমার বিরুদ্ধে যদি আপনারা কেহ কিছু দেখিয়া থাকেন, শুনিয়া থাকেন, আমার চরিত্র বিষয়ে কাহারো

কোন সন্দেহ থাকে, অনুগ্রহ করিয়া বলুন। যদি সত্য হয়, আমি তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিতে প্রস্তুত।”

ক্রমশঃ গৃহী লোকের মধ্যেও এই প্রথা প্রচলিত হয়; কিন্তু তাহার অসুবিধা সংঘটন প্রযুক্ত অশোক রাজা পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধনার্থ একটী মহোৎসব প্রতিষ্ঠিত করেন, তাহাতে প্রথম আত্মদোষ স্বীকার ও সঙ্গে সঙ্গে দান ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, উভয়ই প্রচলিত ছিল। ঐ দানোৎসবটি ৫ বৎসর অন্তর সম্পন্ন হইত। খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতাব্দীতে প্রয়াগক্ষেত্রে একবার ঐ উৎসবের অনুষ্ঠান হয়; চীনদেশীয় তীর্থযাত্রী হিউএন সাং তাহা দর্শন করিয়া যান। তাহার বর্ণনা এইরূপ আছে:—

“ঐ সুবিস্তৃত উৎসব ক্ষেত্র একটী আনন্দক্ষেত্র ছিল, চারিদিকে সহস্র সহস্র গোলাপ গাছের সুরম্য বৃতি, তাহাতে অপর্য্যাপ্ত মনোহর পুষ্পশ্রেণী অহরহ প্রস্ফুটিত, এবং মধ্যস্থলে স্বর্ণ রজত পট্টবস্ত্র ও অপরাপর বহুমূল্য দান দ্রব্যে পরিপূর্ণ সুসজ্জ গৃহশ্রেণী। তাহার সমীপে সারি সারি একশত এরূপ ভোজন-গৃহ ছিল, যাহার প্রত্যেক গৃহে শত ব্যক্তি ভোজন করিতে পারিত। শিলাদিত্য (হর্ষবর্দ্ধন) তখন ঐ অঞ্চলে রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করেন। বৌদ্ধধর্ম্মে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, অথচ তাঁহার রাজ্যে ব্রাহ্মণ্যের প্রতিপত্তিও সামান্য নহে। শিলাদিত্যের আহ্বানক্রমে বিংশতি রাজ্যের রাজারা ব্রাহ্মণ শ্রমণ সৈন্য সামন্ত সহ পঞ্চাশ সহস্র লোক সমভিব্যাবহারে তথায় আগমন করেন। সার্দ্ধ দুই মাস ব্যাপিয়া দান ভোজনাদি সহকারে ঐ উৎসব ব্যাপার সম্পন্ন হয়। এই ধর্ম্ম-মহামণ্ডলীর

পশ্চিমে. এক বৃহৎ সঙ্ঘারাম ও পূর্ব্বে ৬০ হস্ত উচ্চ এক স্তম্ভ নির্ম্মিত হয়। মধ্য ভাগে বুদ্ধের স্বর্ণ মূর্ত্তি মনুষ্যাকৃতিপ্রমাণ স্থাপিত। বুদ্ধ, সবিতা ও শিব, এই তিনেরই প্রতিমূর্ত্তি একে একে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং হিন্দু ও বৌদ্ধ সমস্ত সমাগত ব্যক্তি-দিগকে বহুমূল্য সামগ্রী দান করা এবং চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ সুস্বাদ সামগ্রী ভোজন করান' হয়। বুদ্ধের এক ক্ষুদ্র প্রতিমূর্ত্তি এক সুসজ্জিত গজপৃষ্ঠে স্থাপিত, শিলাদিত্য ইন্দ্রবেশে বামপার্শ্বে এবং কামরূপের রাজা দক্ষিণে, ৫০০ রণহস্তী প্রত্যেকের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়াছে। শিলাদিত্য চতুঃ-পার্শ্বে মুক্তা রজত কাঞ্চন ও অন্যান্য বহুমূল্য জিনিস ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। বুদ্ধ মূর্ত্তি ধৌত হইলে শিলাদিত্য তাহা নিজ স্কন্ধে উঠাইয়া পশ্চিম স্তম্ভে লইয়া যান, ও তদুপরি বহুমূল্য বেশভূষা স্থাপন করেন। ভোজনের পর ব্রাহ্মণ শ্রমণ মিলিয়া একত্রে ধর্ম্ম চর্চ্চা ও বাদানুবাদ হয়। এদিকে ব্রাহ্মণ শ্রমণে বাক্‌যুদ্ধ, অন্যদিকে মহাযানী হীনযানীদের মধ্যেও ঘোর তর্ক বিতর্ক বাধিয়া যায়। এই উৎসবে রাজা স্বীয় রাজকোষ নিঃশেষিত করিয়া প্রায় সমস্ত ধনই বিতরণ করিতেন। এমন কি, তাঁহার নিজের পরিচ্ছদ, কর্ণকুণ্ডল, রত্নমালা প্রভৃতি বেশ-ভুষা সমুদয়ও দেহ হইতে উন্মোচন করিয়া দিতেন।"* অব-শেষে পুরাতন জীর্ণ বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক দীন বেশে বুদ্ধদেবের মহাভিনিষ্ক্রমণ অভিনয় করিতেন।

---

*ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়, দ্বিতীয় ভাগ। অক্ষয় কুমার দত্ত।

হিউয়েন সাং বলেন যে, উৎসবের শেষে স্তম্ভে আগুন লাগিয়া যায়; তাঁহার বিশ্বাস এই যে, রাজা শিলাদিত্যের বৌদ্ধধর্ম্মে শ্রদ্ধা দেখিয়া ব্রাহ্মণেরা ঈর্ষাবশে এই অঘোর কৃত্য ঘটাইয়া দেন, এবং রাজহত্যারও চেষ্টায় ফেরেন—ভাগ্যক্রমে সে চেষ্টা সফল হয় নাই।

ভিক্ষুণী সঙ্ঘ (বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনী)

বৌদ্ধ সঙ্ঘের প্রথম পত্তন কালে তাহা কেবল ভিক্ষুদলে পরিপুষ্ট হয়। প্রথমে স্ত্রীলোকের সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার ছিল না। বুদ্ধদেব, যিনি মানব প্রকৃতির দুর্ব্বলতা সম্যক্ অবগত ছিলেন, যিনি সংযম দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি ষড়রিপুর উপর জয়লাভের উপদেশ প্রদান করিতেন, তিনি যে সঙ্ঘ-গণ্ডীর ভিতর রমণীর প্রবেশে বীতরাগ হইবেন, তাহাতে বিচিত্র কি? স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসী দলে মিশিতে দিলে তাহার অশুভ পরিণাম হইবে, ইহা তাঁহার বিলক্ষণ আশঙ্কা ছিল। যখন বুদ্ধদেবের নিকট আনন্দ প্রথমে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, তখন বুদ্ধ বলিলেন, "স্ত্রীলোকেরা যদি গৃহত্যাগিনী হইয়া সন্ন্যাসিনী না হয়, তাহা হইলে এই ধর্ম্ম সহস্র বৎসর অব্যাহত থাকিবে; আর তাহাদের বৌদ্ধ সঙ্ঘে প্রবেশাধিকার দিলে এ ধর্ম্মের পবিত্রতা শীঘ্রই নষ্ট হইবে, অল্পকালের মধ্যে সত্য ধর্ম্ম লোপ হইবে"। বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার সহজে অর্জ্জিত হয় নাই; অনেক সাধ্যসাধনার পর বুদ্ধদেব রমণীগণকে ভিক্ষুদলে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হন, এবং স্বীয় ধাত্রী মহাপ্রজাপতিকে তাঁহার প্রথম স্ত্রী শিষ্যরূপে বরণ করেন।

স্ত্রীসংসর্গ হইতে দূরে থাকিবার জন্য আটঘাট যতই বাঁধিয়া রাখা যায়, তাহার ফলে তাহাদের সংঘর্ষ এড়াইবার উপায় নাই। ভিক্ষায় বাহির হইয়া দ্বারে দ্বারে পর্য্যটন কর, অথবা গৃহস্থের গৃহে ভোজনের নিমন্ত্রণে যাও, হে ভিক্ষু! রমণী সমাগম হইতে তোমার কিছুতেই নিস্তার নাই। তুমি চাও আর না চাও, তাহাদের দয়া মায়া তোমাকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতে যখন অবরোধ প্রথা তেমন কঠোর ভাবে প্রচলিত ছিল না, লোকসমাজে স্ত্রীলোকেরও মেলামেশা ছিল, যখন জাতীয় উদ্যমে স্ত্রীলোকেরাও যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না—তখনকার ত কথাই নাই। রমণীর সুন্দর ছবি আমরা প্রথম হইতেই বৌদ্ধ সমাজে চিত্রিত দেখিতে পাই। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব্বেই সুজাতার বৃত্তান্ত দেখ। বুদ্ধদেব যখন ৬ বৎসর ধরিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যায় ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন, তখন কে তাঁহাকে অন্নদানে সজীব করিল?

অম্বপালী গণিকা।—

বুদ্ধদেব যখন বৈশালীতে অম্বপালী গণিকার আম্রবনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময় অম্বপালী তাঁর দর্শনার্থ আগমন করিল। তাহার বেশভূষা সামান্য, অথচ সুন্দর মোহন মূর্ত্তি! তাহাকে দেখিয়া বুদ্ধেরও ক্ষণভর তাক লাগিয়া গেল। তিনি মনে মনে ভাবিলেন "স্ত্রীলোকটী কি পরমাসুন্দরী! রাজপুরুষেরাও ইহার রূপলাবণ্যে মোহিত ও বশীকৃত, অথচ এ কেমন সুধীর শান্ত, সচরাচর স্ত্রীলোকের ন্যায় যৌবন-মদ-মত্ত চপলস্বভাব নহে। জগতে এরূপ নারী-রত্ন দুর্লভ।" অম্বপালী

বুদ্ধের পার্শ্বে আসিয়া বসিল। বুদ্ধদেব তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ দিতে তাহার মন বিগলিত হইল, ধর্ম্মে তাহার মতি স্থির হইল। গণিকা বুদ্ধের শরণপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে কহিল—"প্রভু, কল্য ভ্রাতৃমণ্ডলী সহ আমার গৃহে পদার্পণ করিয়া আহারাদি করিলে আমি অনুগৃহীত হইব।" বুদ্ধদেব মৌনভাবে সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

এই সময়ে লিচ্ছবি নাগরিক যুবকেরা রথারোহণ পূর্ব্বক সেই আম্রবনে উপনীত হইল। তাহারা কেহ শুভ্র, কেহ রঙীন বেশে, নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত। বুদ্ধদেব ভিক্ষুদিগকে তাহাদের দেখাইয়া কহিলেন, দেখ ইহাদের কেমন সাজসজ্জা, ঠিক যেন দেবতারা ভূতলে ক্রীড়াকাননে অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা আসিয়া বুদ্ধকে পুনর্ব্বার ভোজনে নিমন্ত্রণ করিলেন, কিন্তু তিনি পূর্ব্বেই গণিকার নিকট প্রতিশ্রুত বলিয়া তাঁহাদের নিমন্ত্রণ অগ্রাহ্য করিতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা চা'ন অম্বপালী তার আমন্ত্রণবাক্য প্রত্যাহার করে—তাহাকে হাত করিবার জন্য কত সাধ্য সাধনা কাকুতি মিনতি করিলেন, কত ধনলোভ দেখাইলেন, কিন্তু কিছুতেই সে সম্মত হইল না। সে বলিল "তোমরা সমস্ত বৈশালী নগর উপনগর সর্ব্বশুদ্ধ আমাকে দান কর, তাহা হইলেও আমি নিমন্ত্রণ বারণ করিয়া পাঠাইতে পারিব না।" লিচ্ছবিগণ অম্বপালীকে ধিক্কার দিতে দিতে অধোবদনে ফিরিয়া গেলেন।

পরদিন প্রাতে বুদ্ধদেব গাত্রোত্থান করত বসনত্রয় পরিধান পূর্ব্বক অম্বপালীর ভবনে সশিষ্য সমাগত হইলেন।

অম্বপালী নানাবিধ অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা তাহাদের পরিতোষ সাধন করিল; এবং আহারান্তে ভগবান বুদ্ধকে করযোড়ে নিবেদন করিল—"আমার এই উদ্যানগৃহ ভগবান বুদ্ধ ও তাঁহার সঙ্ঘে সমর্পণ করিতেছি—এই সামান্য উপহার গ্রহণ করিয়া আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন।" বুদ্ধদেব গণিকার সেই প্রীতির উপহার গ্রহণ করিলেন, ও তাহাকে বহুতর ধর্ম্মোপদেশ-দানে শিষ্যত্বে বরণ করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

বিশাখা।—

বৌদ্ধ শাস্ত্রে যে-সকল সাধ্বী কুলস্ত্রীর উল্লেখ আছে. বিশাখা তাহাদের শীর্ষস্থানীয়। তিনি ধনে পুত্রে সৌভাগ্যবতী—দানশীলতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। গৃহ্য কর্ম্মে ও অনুষ্ঠানে সর্ব্বত্র তাঁহার প্রধান আসন ছিল—তাঁহার মত অতিথির আতিথ্য সৎকারে বহু পুণ্য উপার্জিত হয়, লোকের এই ধারণা। বুদ্ধ যখন তাঁহার শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে কোশল রাজধানী শ্রাবস্তীতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন বিশাখা ভিক্ষুদের অভ্যর্থনা জন্য প্রচুর আয়োজন করেন। একদিন বিশাখার গৃহে বুদ্ধদেব শিষ্য-মণ্ডলী সহ ভোজন করেন। ভোজনান্তে বিশাখা কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন—"ভগবন, আমার কয়েকটী নিবেদন আছে, শ্রবণ করুন।" বুদ্ধ কহিলেন,—বল, কিন্তু সকলগুলি গ্রাহ্য হইবে কি না, তাহা বলিতে পারি না।

বিশাখা কহিলেন:—

"আমার ইচ্ছা আমি যতদিন জীবিত থাকি ভিক্ষুদিগকে বর্ষায় বস্ত্র দান করিব, নবাগত ভ্রাতৃগণকে অন্নদান করিব।

পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ঔষধ পথ্য প্রদান, তাহাদের অনুচরবর্গকে অন্নদান, ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষান্ন বিতরণ, ভিক্ষুণীদিগকে বস্ত্রদান, এই সকল সৎপাত্রে দান করি আমার একান্ত ইচ্ছা।”

বুদ্ধ কহিলেন “তোমার কি অভিপ্রায় স্পষ্ট করিয়া বল।”

তখন বিশাখা তাঁহার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া কহিলেন :—

“ভগবন, বিদেশ হইতে এখানে অনেক ভিক্ষু আসেন, তাঁহারা এখানকার পথ ঘাট কিছুই জানেন না। তাঁহাদের ভিক্ষা সংগ্রহ বহু আয়াসসাধ্য। এই সমস্ত আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে আমি যে অন্নদান করিব, তাঁহারা তাহা আহার করিয়া ইচ্ছামত নগর পরিদর্শন করিতে পারিবেন। আমি ইহাদিগকে অন্নদান করিতে ইচ্ছা করি। কোন পরিব্রাজক শ্রমণ ভ্রমণের সময় যদি অন্নসংস্থানে ব্যস্ত থাকেন, তাহা হইলে তিনি হয়ত তাঁহার দলের পিছনে পড়িয়া থাকিবেন, নাহয়ত তাঁহার গম্যস্থানে সময়মত পৌঁছিতে পারিবেন না। তিনি যদি আমার অন্নছত্র হইতে প্রস্তুত অন্ন ভোজন করিতে পান, তাহা হইলে এইরূপ কষ্টভোগ হয় না, তিনি ইচ্ছামত ভ্রমণ ও বিশ্রাম করিতে পারেন। পরিব্রাজকদিগকে অন্নদান, এই আমার দ্বিতীয় ইচ্ছা। প্রভো! আবার দেখুন, অনেক সময় এইরূপ ঘটে যে, অচিরা-বতী নদীতে ভিক্ষুণীরা স্নান করিতে নামে, আর তাহাদের সঙ্গে অনেক বারাঙ্গনাও একই সময়ে স্নান করিতে আসে। এই নির্লজ্জ স্ত্রীরা উপহাস করিয়া বলে, ‘এই বয়সে তোমরা ধর্ম্মসাধনে কেন এত কষ্ট করিতেছ? এই বেলা মনের সাধে হেসে খেলে নেও—শেষ বয়সে যা ধর্ম্ম করিবার করিও—ইহকাল পরকাল

দুদিক্ রক্ষা হইবে।' এইরূপ উপহাসে বেচারী ভিক্ষুণীরা বড়ই লজ্জিত ও বিরক্ত হয়। লজ্জাই স্ত্রীলোকের ভূষণ, বিবস্ত্রা হইয়া নির্লজ্জ ভাবে নদীতে স্নান করিতে নামা তাহাদের পক্ষে শোভন নহে। তাহাদের স্নান-বস্ত্র যোগাইতে পারি, এই আমার তৃতীয় ভিক্ষা।"

বুদ্ধ কহিলেন "আচ্ছা, তোমার এই সকল সাধু ইচ্ছা পূর্ণ হউক, আর আশীর্ব্বাদ করি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান, তৃষ্ণাতুরে পানীয় দান, পরিশ্রান্ত জনে আসন, রোগীকে ঔষধ পথ্য প্রদান—অশন বসন ঔষধ পথ্য যাহার যা চাই তাহা যথেচ্ছা দান করিবার ক্ষমতা তোমার অক্ষয় থাকুক। পরের দুঃখ হরণ ও কুশল বর্দ্ধন—এই সকল পুণ্য কার্য্যে নিরন্তর রত থাকিয়া পরত্রে তোমার সুকৃতির ফল ভোগ করিতে থাক।"

বিশাখার নিকট বৌদ্ধ সঙ্ঘ অনেক বিষয়ে ঋণী; তিনি নগরের পূর্ব্বদিকস্থ একটী সুরম্য উদ্যান সঙ্ঘে উৎসর্গ করেন, তাহার নাম "পূর্ব্বারাম।"

সুজাতা।—

উপরে এক সতী সাধ্বী সুজাতার কথা বলিয়াছি, এবার আর এক ধরণের স্ত্রী "ঘরের কর্ত্রী রুক্ষ মূর্ত্তি" রঙ্গ-ভূমিতে অবতীর্ণা দেখিবেন! ইনি একজন বড়মানুষের ঘরের আদুরে মেয়ে, ইঁহার নামও সুজাতা। বুদ্ধদেব ইঁহার প্রতি কিরূপ বশীকরণ মন্ত্র প্রয়োগ করিলেন, তাহার বৃত্তান্ত এই।—তিনি একদিন ভিক্ষা-পর্য্যটনে বণিক অনাথপিণ্ডদের বাড়ী আসিয়া শুনিতে পাইলেন,

সেই গৃহে মহা কলরব উপস্থিত। বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ কিসের গোল, মনে হয় যেন মেছুনীদের মৎস্য চুরি গিয়াছে।" অনাথপিণ্ডদ তাঁহার দুঃখের কাহিনী বুদ্ধের নিকট খুলিয়া কহিলেনঃ—"আমার একটি পুত্রবধূ বড় ঘরের মেয়ে, সে আজ আমার বাড়ী আসিয়াছে। মেয়েটি বড় অবাধ্য, কাহারো কথা শুনে না, স্বামীর কথা মানে না, শ্বশুর শাশুড়ীর অবমাননা করে— বুদ্ধের পরেও তার কোন অনুরাগ নাই।" বুদ্ধ সুজাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, "এস হে সুজাতা, কাছে এস।" সুজাতা নিকটে আসিলে বুদ্ধদেব কহিলেন, "সুজাতা, স্ত্রী সাত প্রকার,— কেহ ভীমা উগ্রচণ্ডা, কেহ কুটিলা কলহপ্রিয়া, কেহ প্রিয়ম্বদা, কেহ সুশীলা, কেহ সুগৃহিণী, কেহ প্রিয়সখী, কেহ সেবিকা। তুমি কোন্ ধরণের স্ত্রী?" সুজাতা তখন তাঁর মান অভিমান ভুলিয়া গিয়া উত্তর করিলেন, "প্রভু, যে প্রশ্ন করিতেছেন আমি তার অর্থ বুঝিতে পারিলাম না—আমাকে বুঝাইয়া বলুন।" বুদ্ধ—"আমি তোমাকে বুঝাইয়া বলিতেছি, প্রণিধান পূর্ব্বক শ্রবণ কর।" পরে তিনি সাত প্রকার স্ত্রীর বর্ণনা করিলেন,—অসতী স্ত্রী, চপলস্বভাবা, কুলকলঙ্কিনী, স্বামীকে যিনি ভাল বাসেন না, এই অধমা হইতে আরম্ভ করিয়া, উত্তমা সতীলক্ষ্মী পতিব্রতা, পতি যাঁর একমাত্র ধন, যিনি দাসীর ন্যায় পতিসেবাতৎপর ও পতির একান্ত বাধ্য এবং আজ্ঞাবহ। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সাত প্রকার স্ত্রীর মধ্যে তুমি কার মতন?" তখন সুজাতার চৈতন্য হইল, তিনি কহিলেন, "ভগবন, আমাকে পতিব্রতা সতী স্ত্রীর মত মনে করুন, আমি অন্য কোনরূপ স্ত্রী হইতে ইচ্ছা করি না।"

এই সকল গল্পের স্রোতে অনেক দূর আসিয়া পড়িয়াছি, এখন ফিরিয়া গিয়া আসল কথা পাড়া কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বৌদ্ধ সঙ্ঘে স্ত্রীজাতির প্রবেশাধিকার অনেক সাধ্য সাধনার ফল। প্রথমে গৌতমী মহাপ্রজাপতি স্ত্রীলোকদিগের জন্য এই অধিকার প্রার্থনা করেন, কিন্তু তাঁহার সেই আবেদন অগ্রাহ্য হয়। পরে আনন্দ আবার এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধদেবের নিকট নিবেদন করিলেন, "স্ত্রীলোক সন্ন্যাসধর্ম্ম অবলম্বন করিলে কি তাহার ফললাভে সক্ষম হয় না? তাহারা কি আর্য্য মার্গ অনুসরণ করিয়া অর্হৎ হইবার অধিকারিণী নহে?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "তাহারা অধিকারিণী, সত্য।" "তবে কেন মহাপ্রজাপতিকে সঙ্ঘভুক্ত করা না হয়? ভগবন, তিনি আপনার মাতৃবিয়োগে স্বীয় স্তন্যদুগ্ধ দিয়া আপনাকে লালন পালন করিয়াছেন, তিনি প্রভুর পরম ভক্ত, পরম উপকারিণী সেবিকা, তাঁহাকে এ অধিকার হইতে বঞ্চিত রাখা কি উচিত হয়?" পরে বুদ্ধদেব বৌদ্ধ তপস্বিনীদের জন্য কতকগুলি নিয়ম বাঁধিয়া দিলেন, তাহার সারাংশ এই যে, ভিক্ষুণীরা স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন না করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভিক্ষুমণ্ডলীর আজ্ঞাবহ থাকিবেন। মনুর যে বিধান—"শৈশবে পিতার অধীন, যৌবনে পতির অধীন, বৃদ্ধ বয়সে সন্তানের অধীন, স্ত্রীলোক কোন কালেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবেন না"—ভিক্ষুণীর প্রতি বুদ্ধানুশাসন ইহারই অনুযায়ী। সন্ন্যাসিনী হইয়াও স্ত্রীলোকের কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য নাই। তাঁহাদের প্রতি যে অষ্টানুশাসন আছে, তাহা এই :—

১। ভিক্ষুদিগকে সম্ভ্রম ও ভক্তিশ্রদ্ধা করিবে।

২। যে প্রদেশে ভিক্ষু নাই, ভিক্ষুণী সেখানে বর্ষাযাপন করিবেন না।

৩। প্রত্যেক পক্ষে ভিক্ষুণী ভিক্ষু-সঙ্ঘের অনুমতি লইয়া উপবাসাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবেন, ও সঙ্ঘের নিকট হইতে উপদেশ গ্রহণ করিবেন।

৪। বর্ষার উৎসব উদ্‌যাপিত হইলে ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ উভয়ের সমক্ষে পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য (প্রবারণ) ব্রত পালন করিবেন।

৫। উভয় সঙ্ঘ হইতে 'মানত' শাসন গ্রহণ করিবেন।

৬। দুই বৎসর অধ্যয়নের পর উভয় সঙ্ঘ হইতে উপসম্পদা দীক্ষা লাভ করিবেন।

৭। শ্রমণদের নিন্দা ও তাহাদের প্রতি পরুষবাক্য প্রয়োগ করিবেন না।

৮। ভিক্ষুরা তাঁহাদের দোষ বলিয়া দিয়া তাঁহাদিগকে সৎ পথে রক্ষা করিবেন, কিন্তু ভিক্ষুদের প্রকাশ্যে দোষ ধরা ভিক্ষুণী-দের সর্ব্বতোভাবে নিষিদ্ধ।

মহাপ্রজাপতি এই ধর্ম্মানুশাসন গ্রহণ করিয়া বুদ্ধের প্রথমা শিষ্যা রূপে দীক্ষিতা হইলেন। পরে তিনি এক সময়ে ভিক্ষু ভিক্ষুণী যাহাতে গুণ ও কর্ম্মানুসারে সমান মানমর্য্যাদার অধি-কারী হয়, এইরূপ প্রস্তাব করেন; কিন্তু বুদ্ধদেব তাহাতে সম্মত হইলেন না। কালক্রমে ভিক্ষুণীদের উপযোগী স্বতন্ত্র নিয়মাবলী প্রস্তুত হইল। ভিক্ষুণী ভিক্ষুমণ্ডলীর সহচরী হইয়া ফিরিবেন, স্বেচ্ছাচারিণী হইয়া কুত্রাপি গমনাগমন করিবেন না। বুদ্ধের

আদর্শ সন্ন্যাসিনী কিরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন, তাহা মহাপ্রজাপতির প্রতি তাঁহার যে উপদেশ, তাহাতেই ব্যক্ত হইয়াছে। তৃষ্ণা পরিহার, অল্পেতে সন্তুষ্ট থাকা, বৃথা আমোদ প্রমোদ হইতে দূরে থাকিয়া নির্জ্জনে ধ্যান ধারণা ধর্ম্মসাধন করা, আলস্য ত্যাগ করিয়া শ্রমশীলা হওয়া, অভিমান পরিত্যাগ করিয়া সুশীলা, বিনয়ী ও নম্র হওয়া, সকলের সহিত সদ্ভাবে সন্তোষের সহিত জীবন যাপন করা.—বৌদ্ধ তপস্বিনী এইরূপ শুদ্ধাচার অবলম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় ব্রত পালন করিবেন।

বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীর সংখ্যা ভিক্ষুদের তুলনায় অনেক কম, তাঁহাদের উপদেশ ও দৃষ্টান্তের বল বৌদ্ধ সঙ্ঘে সেই পরিমাণে অল্প হইবারই কথা। অথচ এদিকে দেখা যায় বৌদ্ধতাপসীগণ জনসমাজে বহুমানের পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের বিদ্যা, বুদ্ধি, নয়কৌশল, সম্ভ্রান্ত পরিবারে গতিবিধি, তাঁহাদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার পরিচয়, মালতী-মাধব প্রভৃতি সংস্কৃত নাটকের স্থানে স্থানে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৌদ্ধ পরিব্রাজিকা নিজ বিদ্যা বুদ্ধি পুণ্যবলে শ্রমণাপদে আরূঢ় হইতে পারিতেন; এমন কি, তিনি অর্হৎ হইবারও অধিকারিণী ছিলেন। ক্ষেমা প্রভৃতি অনেকানেক বৌদ্ধতপস্বিনীদের প্রখর বুদ্ধি ও পাণ্ডিত্যগুণে বৌদ্ধসমাজে বিলক্ষণ খ্যাতি প্রতিপত্তি দৃষ্ট হয়।

ক্ষেমার সন্ন্যাস গ্রহণ।—

ভিক্ষুণী-সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠা হইবার পর বিম্বিসার-পত্নী ক্ষেমার সন্ন্যাস গ্রহণ উল্লেখযোগ্য। বুদ্ধদেব যখন শ্রাবস্তী হইতে রাজ-গৃহে ফিরিয়া গিয়া বেণুবনে ষষ্ঠ বর্ষা যাপন করিতেছিলেন, সেই

সময়ে ক্ষেমা রাণীর দীক্ষা হয়। তিনি অপরূপ রূপ লাবণ্য গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া বুদ্ধদেবের দর্শন লাভ কখন মনেও স্থান দেন নাই। একদিন দৈবক্রমে তিনি বেণুবনে বেড়াইতে বেড়াইতে বুদ্ধের আশ্রমের নিকট গিয়া উপস্থিত হন। বুদ্ধদেব দিব্যজ্ঞানে তাঁহার মনোভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার গর্ব্ব খর্ব্ব করিবার মানসে মায়াবলে স্বর্গ হইতে এক পরমা সুন্দরী অপ্সরা আনিয়া তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন—রাণী তাহার প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে সেই রমণী যৌবন, বার্দ্ধক্য, জরা একে একে অতিক্রম করিয়া মৃত্যুর দ্বারে আসিয়া পৌঁছিল। এই দৃশ্য দেখিয়া ক্ষেমার মনে বৈরাগ্যের সঞ্চার হয় ও গুরুমন্ত্র গ্রহণের জন্য তাঁহার মানসক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। ঐ অবসরে ভগবান বুদ্ধ কতিপয় মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক তাঁহার কানে যেন মধু বর্ষণ করিয়া দিলেন। অতঃপর তথাগতের সদুপদেশ শ্রবণে ক্ষেমা সংসার ত্যাগ করিয়া স্বামীর অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক ভিক্ষুণী সম্প্রদায়ে প্রবিষ্ট হন এবং অচিরাৎ অর্হৎ পদবী অর্জ্জন করেন। তিনি তথাগতের অগ্রশ্রাবিকা মধ্যে পরিগণিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে স্থান পাইতেন। এই হেতু তাঁহাকে 'দক্ষিণ হস্ত' শ্রাবিকা বলিত।

উৎপলবর্ণা।—

উৎপলবর্ণা কোন এক ধনবান গৃহপতির কন্যা ছিলেন—এই প্রসঙ্গে তাঁহার নামোল্লেখ করা যাইতে পারে। এই কন্যাটী রূপে গুণে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার পাণিগ্রহণের প্রার্থীরও অভাব ছিল না। তাঁহার পিতা মনে মনে ভাবিলেন,—যদি ইহাকে

কোন রাজা বা যুবরাজের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়, তাহা হইলে তাঁহার শত্রুসংখ্যা বৃদ্ধি পাইবে, প্রার্থীদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব বাধিয়া যাইবে। এই ভাবিয়া তিনি তাহাকে চিরকুমারী রাখিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করাইলেন। এই কুমারী স্বীয় তপস্যার প্রভাবে অচিরাৎ অর্হৎ পদ লাভ করিলেন। উৎপলবর্ণা বুদ্ধের এক অগ্রশ্রাবিকা। ইনি সর্ব্বদাই গুরুদেবের বামপার্শ্বে বসিতেন বলিয়া, 'বামহস্ত' শ্রাবিকা নামে অভিহিত হইতেন।

থেরীগাথায় নিম্নলিখিত থেরীগণের নামোল্লেখ আছে ঃ—

পূর্ণা, ভিস্যা, ধীরা, মিত্রা, ভদ্রা, উপশমা, মুক্তা, ধর্ম্মদণ্ডা, বিশাখা, সুমনা, উত্তরা, ধর্ম্মা, সঙ্ঘা, জয়ন্তী, আঢ্যকাশী, চিত্রা, মৈত্রিকা, অভয়া, শ্যামা, উত্তমা, দন্তিকা, শুক্লা, শেলা, সোমা, কপিলা, বিমলা, সিংহা, নন্দা, মিত্রকালী, বকুলা, সোনা, চন্দ্রা, পটাচারা, বাশিষ্টী, ক্ষেমা, সুজাতা, অনুপমা, মহাপ্রজাপতি, গৌতমী, গুপ্তা, বিজয়া, চালা, বৃদ্ধমাতা, কৃশাগৌতমী, উৎপলবর্ণা, পূর্ণিমা, অম্বপালী, রোহিনী, চম্পা, সুন্দরী, শুভা, ঋষিদাসী, সুমেধা ইত্যাদি।

সূত্রপিটকে থেরাগাথা ও থেরীগাথা নামক দুইখানি গাথা সংগ্রহ পুস্তক আছে, তাহাদের ভাষ্যে রচয়িতা রচয়িত্রীদের নাম ও জীবনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। তাহা হইতে দেখা যায় যে, অনেকানেক স্থবিরা তপস্বিনী গৌতমের জীবদ্দশায় থেরীগাথা রচনা করেন। অনেকগুলি গাথা অতি সুন্দর, ও লেখিকার সুবুদ্ধি এবং ধর্ম্মশীলতার পরিচয় প্রদান করে। এই

সকল তপস্বিনী বৌদ্ধ ধর্ম্মের উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা ও উপদেশ দিতেন, ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ সেই উপদেশ শ্রবণ করিতে আসিত, ও শুনিয়া মোহিত হইত। থেরীভাষ্যে সোমা নামক একটী তাপসীর কথা আছে, তিনি রাজা বিম্বিসারের সভাপণ্ডিতের কন্যা, দীক্ষালাভের পর ধ্যান ধারণা সাধনার দ্বারা অর্হৎপনা লাভ করেন। তিনি শ্রাবস্তীর নিকটস্থ এক উপবনে বৃক্ষতলে ধ্যানমগ্না আছেন, এমন সময় 'মার' আসিয়া তাঁহার ধ্যান ভঙ্গ করিবার মানসে ভয় দেখাইতে লাগিল—

বহু তপস্যার ফলে যোগী ঋষি লভয়ে যে স্থান,
তুমি নারী, কেমনে পাইবে বল তাহার সন্ধান!
চিরকাল রাঁধ বাড়, তবুও ত পাকিল না হাত,
টিপিয়া দেখিতে হয় বার বার ফুটেছে কি ভাত!

তখন স্থবিরা উত্তর করিলেন—

নারীজন্ম লভিয়াছি, বল তাহে ক্ষতি কি আমার,
নরনারী সবাকার সত্যলাভে তুল্য অধিকার।
একাগ্র করিয়া চিত, আপনায় করিয়া নির্ভর,
অর্হতের পথ ধরি, ধীরে ধীরে হব অগ্রসর।
বিষয় বাসনা যত, কালে হবে ছিন্ন মূল তার,
সত্যের আলোকে আর ঘুচে যাবে অজ্ঞান আঁধার।
জান্ ওরে ভাল করে, আপনারে দেখ্ দুরাশয়,
আমিও চিনেছি তোরে, নাহি আর নাহি কোন ভয়।

বৌদ্ধ গৃহস্থ।—

বৌদ্ধধর্ম্ম গৃহস্থাশ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, এ তাহার এক প্রধান দোষ, কেন না ইহা কে না স্বীকার করিবে যে, উদাসীন সম্প্রদায় বিস্তৃত হইলে সমাজ রক্ষা সুকঠিন। সকলেই সন্ন্যাসী হইয়া বাহির হইলে মনুষ্যকুল ধ্বংস হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গে স্বয়ং সন্ন্যাসী দলও বিনষ্ট হইয়া যায়! দেখুন ভিক্ষুদের ধনোপার্জ্জনের পথ বন্ধ—তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন, রক্ষণাবেক্ষণ সকলি গৃহস্থের বদান্যতার উপর নির্ভর। ভিক্ষু গৃহীর অন্নেই প্রতিপালিত, গৃহীর প্রসাদেই তাহার বাস পরিচ্ছদের সংস্থান। গৃহস্থেরা যদি গৃহত্যাগ করিয়া ভিক্ষু হইয়া বাহির হয়, তাহা হইলে সংসার যন্ত্রের কল বন্ধ হইয়া যায়, অন্নাভাবে সন্তানাভাবে মনুষ্যসমাজ—বৌদ্ধ সঙ্ঘ—সকলি উচ্ছন্ন হইয়া যায়। বুদ্ধদেব স্বয়ং ইহা সম্যকরূপে অবগত ছিলেন, এই হেতু ভিক্ষু ছাড়া গৃহস্থ শিষ্যও বৌদ্ধ সমাজের অঙ্গীভূত ছিল। কিন্তু বৌদ্ধ সঙ্ঘের সহিত বৌদ্ধ গৃহস্থের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল না। গৃহস্থকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার এক ত্রিশরণ মন্ত্র ভিন্ন আর কোন বিশেষ অনুষ্ঠান ছিল না। আচারবিচারে বৌদ্ধ গৃহস্থ স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া চলুন, তাহাতে কাহারো কোন আপত্তি নাই—বৌদ্ধ ভিক্ষুদিগকে অন্নাচ্ছাদনে পোষণ করাই তাঁহাদের কার্য্য। বৌদ্ধ গৃহস্থের নাম উপাসক উপাসিকা, তাঁহারা একপ্রকার কনিষ্ঠ অধিকারী। বুদ্ধের খাস শিষ্যমণ্ডলীতে প্রবেশ করিতে গেলে সঙ্ঘভুক্ত হওয়া আবশ্যক—তাঁহারা

অনেকে ততদূর যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না; ভিক্ষুদিগকে সংরক্ষণ করাই তাঁহাদের বুদ্ধত্বের লক্ষণ।

ভিক্ষুদের জন্য বুদ্ধদেব যে সকল নিয়ম বাঁধিয়া দেন, তাহার কতকগুলি নিয়ম গৃহস্থের পালনীয়। ধার্ম্মিক সূত্রে গৃহস্থের কুলধর্ম্ম বলিয়া যে সকল বিধান দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে জীবহত্যা, চুরি, মিথ্যাভাষণ, ব্যভিচার ও সুরাপান, এই পঞ্চ নিষেধ সর্ব্বসাধারণ—ইহা ছাড়া আরো কতকগুলি অনুশাসন আছে, যথা—

অকাল ভোজন করিবে না।

মাল্য গন্ধদ্রব্য প্রভৃতি ব্যবহার করিবে না।

মাদুর বিছাইয়া ভূমিতে শয়ন করিবে।

এই তিনটি বিধান গৃহস্থের প্রতি ততটা বন্ধনকারী নয়, তথাপি শুদ্ধাচারী গৃহস্থের পালনীয়।

উপবাস।—

অমাবস্যা পূর্ণিমা ও আর দুই দিন—মাসের মধ্যে এই চার দিন উপবাস। তা ছাড়া প্রতিহার পক্ষও রক্ষণীয়।

প্রতিহার পক্ষ কি, না বর্ষার ৩ মাস এবং বর্ষার পর-মাস, যাহাকে চীবর মাস বলে, অর্থাৎ নূতন চীবর ধারণের সময়। চীবর ধারণের অর্দ্ধমাস উপবাস প্রভৃতি ব্রত পালনের প্রশস্ত কাল।

এই সমস্ত নিয়ম ও ব্রত পালন ভিক্ষু ও গৃহস্থের পক্ষে সমান, প্রভেদ এই যে কতকগুলি বিধান, যাহা ভিক্ষুদের অবশ্য

পালনীয়, গৃহস্থের উপর তাহার ততটা বন্ধন নাই; আর দুইটি নিষেধ ভিক্ষুদের জন্যই করা হইয়াছে - অর্থাৎ নৃত্য গীত নাট্যাদি দর্শন না করা, এবং সোণা রূপা গ্রহণ না করা—এই দুই গৃহস্থ সমাজে খাটে না। তেমনি আবার গৃহীদের প্রতি কতকগুলি বিশেষ বিধান আছে, যথা, সাধুজীবিকা অবলম্বন করা, পিতা মাতাকে ভক্তি করা, গুরুজনকে মান্য করা, ভিক্ষুদিগকে অন্ন বস্ত্র দান দ্বারা পোষণ করা, ইত্যাদি। শৃগালবাদ সূত্রে গৃহীধর্ম্ম আরো বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সারাংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বুদ্ধদেব রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী বেণুবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ভিক্ষায় বাহির হইবার সময় দেখিলেন শৃগাল নামক জনৈক গৃহস্থ আর্দ্রবেশে কৃতাঞ্জলিপুটে, উপরে আকাশ নীচে পাতাল, চারিদিক নিরীক্ষণ করত নমস্কার করিতেছেন। কারণ জিজ্ঞাসা করাতে শৃগাল বলিলেন—"ভগবন, পিতৃকুলের তর্পণ উদ্দেশে এইরূপ করিতেছি।" পরে এই আট দিক কি উপায়ে সুরক্ষিত হইতে পারে, বুদ্ধদেব সেই বিষয়ের উপদেশ প্রদান করিলেন :—

জলসিঞ্চনে নয়, কিন্তু শুভ চিন্তা ও কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বদিক সুরক্ষিত হয়। পূর্ব্ব দিকে আলোক সঞ্চার হয়, পূর্ব্বমুখী হইয়া পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিবে। দক্ষিণে ধনাগম, দক্ষিণ মুখে গুরুর প্রতি কর্ত্তব্য চিন্তন করিবে। পশ্চিমে দিবসাবসানের সুরাগ ও শান্তি—পশ্চিমমুখী হইয়া স্ত্রীপুত্রের মঙ্গল চিন্তা করিবে। উত্তরে বন্ধুবান্ধব আত্মীয় স্বজন, ঊর্দ্ধে

ব্রাহ্মণ শ্রমণ সাধু সজ্জন, অধোতে দাস পরিজনের প্রতি কর্ত্তব্য স্মরণ ও মনন করিলে ছয় দিক সুরক্ষিত থাকিবে—সর্ব্ব অমঙ্গল দূর হইবে।

মনুষ্যের পরস্পারের প্রতি কর্ত্তব্য সাধনের নিয়ম এই—

পিতা পুত্র—

পুত্রের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য

১। পুত্রকে পাপ হইতে নিবৃত্ত করা

২। ধর্ম্ম শিক্ষা দান

৩। বিদ্যাদান

৪। পুত্রের বিবাহ—সৎপাত্রে কন্যাদান

৫। বিষয়াধিকার প্রদান

পুত্রের কর্ত্তব্য

১। পিতা মাতার ভরণপোষণ করা

২। কুলধর্ম্ম রক্ষণ

৩। বিষয় রক্ষা

৪। পিতার যোগ্য পুত্র হইবার চেষ্টা

৫। পিতা মাতার স্মৃতি রক্ষা

গুরু শিষ্য—

গুরুর প্রতি শিষ্যের কর্ত্তব্য

১। গুরুভক্তি

২। গুরুর সেবাশুশ্রূষা

৩। আজ্ঞা পালন

৪। গুরুদক্ষিণা দান

৫। বিদ্যাভ্যাস

শিষ্যের প্রতি গুরুর কর্ত্তব্য

১। স্নেহ ও শিষ্টাচার

২। ধর্ম্মশিক্ষা ও উপদেশ প্রদান

৩। আপদ বিপদ হইতে সংরক্ষণ

স্বামী স্ত্রী—

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য

১। সম্মান প্রদর্শন

২। ভালবাসা

৩। একনিষ্ঠতা

৪। ভরণপোষণ বেশভূষায় তুষ্টি সাধন

স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্ত্তব্য

১। গৃহকার্য্যে দক্ষতা

২। অতিথি সেবা

৩। সতীত্ব রক্ষা

৪। মিতব্যয়ী হওয়া

৫। শ্রমশীলতা

বন্ধুর প্রতি বন্ধুর কর্ত্তব্য

১। উপহার দান

২। মধুরালাপ

৩। কল্যাণ-কামনা

৪। আত্মবৎ ব্যবহার

৫। সুখ-সম্পত্তি বাঁটিয়া ভোগ করা

সখ্য-লক্ষণ

১। বিপদে রক্ষা করা

২। বিষয় রক্ষা

৩। আশ্রয় দান

৪। বিপদ কালে বন্ধুকে পরিত্যাগ না করা

৫। পরিবার পোষণ

প্রভু-ভৃত্য—

ভৃত্যের প্রতি প্রভুর কর্ত্তব্য

১। যথাশক্তি তাহার কৰ্ম্ম বিভাগ করিয়া দেওয়া

২। অন্ন, বেতন, পারিতোষিক দান

৩। ঔষধ পথ্য প্রদান

৪। ভাল জিনিস পাইলে বাঁটিয়া দেওয়া

৫। কৰ্ম্ম হইতে মধ্যে মধ্যে অবকাশ দান

প্রভুর প্রতি ভৃত্যের কর্ত্তব্য

১। উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন

২। সকলের শেষে বিশ্রাম করা

৩। সন্তোষ অবলম্বন

৪। কায়মনে প্রভু-সেবা করা

৫। সবিনয় সম্ভাষণ

ব্রাহ্মণ শ্রমণের প্রতি গৃহীর কর্ত্তব্য

১। কায়মনোবাক্যে প্রিয়কার্য্য সাধন

২। আতিথ্য

৩। অন্ন বস্ত্র দান

গৃহীর প্রতি ভিক্ষুর কর্ত্তব্য

১। পাপ হইতে নিবৃত্ত করা

২। ধর্ম্মোপদেশ প্রদান

৩। শিষ্টাচার

৪। ধর্ম্ম বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন

৫। মুক্তিপথ প্রদর্শন

এইরূপে পরস্পর কর্ত্তব্য পালন করিলে ছয় দিক সুরক্ষিত ও গৃহস্থের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ হয়।

দান সৌজন্য দয়া দাক্ষিণ্য নিঃস্বার্থতা গৃহস্থ জীবনের পরম সম্বল।

শৃগাল বৌদ্ধধর্ম্মে উপাসকরূপে গৃহীত হইলেন।

এই সমস্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান আষ্টাঙ্গিক আর্য্যমার্গের প্রথম সোপান। এই পথে চলিতে চলিতে মুমুক্ষু ব্যক্তি কালক্রমে অর্হৎমণ্ডলীর সহবাসের যোগ্য হইয়া সেই শান্তিধামে উপনীত হয়েন, যেখানে রোগ নাই, শোক নাই, মৃত্যু নাই, সকল পাপের ক্ষয়, সর্ব্ব দুঃখের অবসান হয়। সেই নির্ব্বাণ—সে অবস্থা দেবতাদিগেরও স্পৃহণীয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র।

শাক্যসিংহ কোন লিখিত গ্রন্থ রাখিয়া যান নাই; বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে তাঁহার কথাবার্ত্তা উপদেশ নিয়মাদি শ্রুতিপরম্পরায় শিষ্যমুখে দীর্ঘকাল জীবিত থাকে, পরে কোন সময়ে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়। বুদ্ধের মরণোত্তর বৌদ্ধদের চারিটি মহাসভার উল্লেখ করা গিয়াছে, এই স্থলে তাহার পুনরাবৃত্তি করা যাইতে পারে। বুদ্ধদেবের মৃত্যুর কিছু পরেই মহাকাশ্যপের মন্ত্রণায় রাজা অজাতশত্রুর আশ্রয়ে রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় প্রথম সভার অধিবেশন হয়। উহার এক শতাব্দী পরে কালাশোক, তৎপরে অশোক রাজা, এবং খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৩ শতাব্দে কাশ্মীরের শকজাতীয় রাজা কণিষ্ক যথাক্রমে বৈশালী, পাটলিপুত্র ও জালন্ধরে এক একটি সভা করেন। ইহার প্রথম ও দ্বিতীয় সভায় বুদ্ধের উপদেশ ও কথাবার্ত্তা সঙ্কলিত হইয়া বৌদ্ধশাস্ত্র প্রস্তুত ও অশোকের সভায় সেই শাস্ত্র পুনর্ব্বার সমালোচিত ও স্থিরীকৃত হয়। ঐ শাস্ত্র তিন প্রকার— বিনয় পিটক, সূত্র পিটক এবং অভিধর্ম্ম পিটক। এই তিনের সমবেত নাম ত্রিপিটক। ইহাতে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মত ও বিশ্বাস, অনুষ্ঠান প্রণালী, প্রায়শ্চিত্ত বিধান, নীতি, উপাখ্যান, দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি বিনিবেশিত আছে।

পালিভাষায় লিখিত বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলি সমধিক প্রাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। তথাপি ত্রিপিটক শাস্ত্র ঠিক কোন্ সময়ে পুঁথি ও গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ হয়, তাহা নির্ণয় করা সুকঠিন। প্রবাদ এই যে, পাটলিপুত্রে যে ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রণীত হয়, অশোকপুত্র মহেন্দ্র তাহা লইয়া সিংহলে গমন করেন, এবং তিনি ঐ সময়ে ত্রিপিটকের পালি ভাষ্যও মগধ হইতে আনাইয়া সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন। কেহ কেহ বলেন ত্রিপিটকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কণ্ঠস্থ করিয়া তিনি সিংহল যাত্রা করেন। সে যাহা হউক, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে, রাজা বত্ত-গামনীর রাজত্বকালে অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে পালি শাস্ত্র সিংহলে প্রথম লিপিবদ্ধ হয়, এবং বুদ্ধঘোষের সময় অর্থাৎ খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দে যে ঐ শাস্ত্রের পালি পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান ছিল, ইহাও একপ্রকার স্থির সিদ্ধান্ত।* খুব সম্ভব ঐ পাণ্ডুলিপি মহেন্দ্রের সময়ে বিদ্যমান ছিল। এখন বিবেচ্য এই—তাহার কত পূর্ব্বে উহা প্রস্তুত হয়? এই বিষয়ের আভ্যন্তরীণ প্রমাণ এক এই পাওয়া যায় যে, প্রচলিত ত্রিপিটকের ভিতরে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার উল্লেখ আছে, অতএব তাহার উত্তরকালে ত্রিপিটক রচনা হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। আর এক কথা এই যে, ত্রিপিটকের মধ্যে পাটলিপুত্র সভার কোন উল্লেখ নাই, অতএব তৎপূর্ব্বে ইহার রচনাকাল নির্দ্ধারিত হইতে পারে। ইহা হইতে নিদান এইটুকু স্থির বলা যায় যে, বৈশালী এবং পাটলিপুত্র সভার মাঝামাঝি কোন সময়ে

* Introduction to Sacred Books of the East, Vol. X.

ত্রিপিটক শাস্ত্র প্রথম প্রস্তুত হয়। আবার ঐ শাস্ত্র আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, তাহার কিয়দংশ অপেক্ষাকৃত প্রাচীন, যেমন বিনয়ের প্রাতিমোক্ষ ভাগ, এবং বুদ্ধ উপদেশের কিয়দংশ। এই সমস্ত কারণে ত্রিপিটকের কিয়দংশ ধর খৃষ্ট-পূর্ব্ব চতুর্থ শতাব্দে, কতক বা তাহারও পূর্ব্বে বিরচিত। দক্ষিণ অঞ্চলের বৌদ্ধেরা ঐ শাস্ত্র সিংহলী ভাষায় অনুবাদ করেন, ও পরে তাহা ব্রহ্মদেশাদির ভাষায় অনুবাদিত হয়। এ ভিন্ন উহা ভোট, চীন, মোগল, কালমুখ প্রভৃতি উত্তর দেশীয় অন্যান্য ভাষায় অনুবাদিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে।

বৌদ্ধ শাস্ত্রান্তর্গত গ্রন্থাবলীর তালিকা নিম্নে প্রদর্শিত হইল—

বিনয় পিটক (সঙ্ঘ-নিয়মাবলী)

১। সুত্ত বিভঙ্গ { পারাজিকা
প্রায়শ্চিত্ত বিধান }

২। খন্ধক { মহাবগ্‌গ, মহাবর্গ
চুল্লবগ্‌গ, ক্ষুদ্রবর্গ }

৩। পরিবার পাঠ, পরিশিষ্ট।

সুত্তপিটক (বুদ্ধের উপদেশ)

১। দীঘ নিকায়, ৩৪ দীর্ঘ সূত্রসংগ্রহ (মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র প্রভৃতি)

২। মধ্যম নিকায়, ১৫২ মধ্যম সূত্র-সংগ্রহ।

৩। সংযুক্ত নিকায়, সংযুক্ত সূত্র-সংগ্রহ।

৪। অঙ্গুত্তর নিকায়, বিবিধ সূত্র-সংগ্রহ।

৫। ক্ষুদ্রক নিকায়, ক্ষুদ্র সূত্র-সংগ্রহ, ইহার মধ্যে নিম্নোদ্ধৃত ১৫ খানি গ্রন্থ সন্নিবেশিত ঃ—

১। ক্ষুদ্রক পাঠ।

২। ধম্মপদ।

৩। উদান, স্তুতি (৮২ সূত্র)

৪। ইতিবুত্তক, বুদ্ধ কথাবলী।

৫। সুত্ত নিপাত, ৭০ সূত্র।

৬। বিমান বত্থু, স্বর্গ কথা।

৭। পেত বত্থু, প্রেত কথা।

৮। থেরাগাথা, স্থবির-গাথা।

৯। থেরীগাথা, স্থবিরা-গাথা।

১০। জাতক, পূর্ব্বজন্ম কাহিনী।

১১। নিদ্দেস, সারীপুত্রের ব্যাখ্যান।

১২। পতিসম্ভিধামগ্‌গ, প্রতিসম্বোধমার্গ।

১৩। অপদান, অর্হৎ চরিত্র।

১৪। বুদ্ধবংশ, গৌতম ও পূর্ব্ববর্ত্তী ২৪ জন বুদ্ধের জীবনবৃত্ত।

১৫। চরিয়া পিটক, বুদ্ধ-চরিত।

অভিধম্ম পিটক (দর্শন)

১। ধম্মসঙ্গণি।

২। বিভঙ্গ।

৩। কথাবত্থুপকরণ।

৪। পুগ্‌গলপঞ্ঞত্তি।

৫। ধাতুকথা।

৬। যমক, (পরস্পর বিরোধী যুগল কথা সংগ্রহ)।

৭। পট্‌ঠানপকরণ (কার্য্যকারণ নির্ণয়)।

চুল্লবর্গের শেষ দুই খণ্ডে রাজগৃহ ও বৈশালী সভার বিবরণ বর্ণিত আছে, এবং কথিত হইয়াছে যে, প্রথম সভায় উপালী 'বিনয়' আবৃত্তি করেন, আনন্দ 'ধর্ম্ম' পাঠ করেন। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ঐ সময়ে শাস্ত্রের দুই অঙ্গই ছিল, তৎপরে 'ধর্ম্ম' দুই ভাগে বিভক্ত হয়—সূত্র এবং অভিধর্ম্ম। এই অভিধর্ম্ম খণ্ড ক্রমে অপর দুই পিটকের সমকক্ষ হইয়া দাঁড়ায়।

সূত্র বিভঙ্গ।—

বৌদ্ধ সঙ্ঘে অমাবস্যা পূর্ণিমায় যে দোষ ও প্রায়শ্চিত্ত-বিধান পঠিত হয়, সেই ব্যবস্থাগুলি ইহার মূল সূত্রে গ্রথিত। ক্রমে ভাষ্যের উপর ভাষ্য ও টীকা সংযুক্ত হইয়া গ্রন্থখানি বাড়িয়া গিয়াছে। এই সমস্ত নিয়মাবলী সূত্রবিভঙ্গের অঙ্গীভূত।

প্রাতিমোক্ষ।—

প্রায়শ্চিত্ত-বিধানগুলি স্বতন্ত্র আকারে প্রাতিমোক্ষ গ্রন্থে প্রকাশিত হয়। ইহা বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের প্রাচীনতম গ্রন্থ, সঙ্ঘের নিয়মাবলী বুদ্ধ স্বয়ং যাহা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা ইহার মধ্যে থাকাই সম্ভব। তথাপি আশ্চর্য্য এই যে, বৌদ্ধেরা ইহার শাস্ত্রীয় মর্য্যাদা সূত্র বিভঙ্গের সমান জ্ঞান করেন না।

মহাবগ্‌গ } কালক্রমে নানা প্রক্ষিপ্ত অংশে পুষ্টিলাভ
চুল্লবগ্‌গ } করিয়া বর্দ্ধিত আকার ধারণ করিয়াছে। পরিবার পাঠ পরবর্ত্তী কালে সঙ্কলিত।

মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র সূত্র-পিটকের দীর্ঘনিকায়ের অন্তর্গত। ইহাতে বুদ্ধজীবনীর শেষ ৩ মাসের ঘটনাবলী ও মরণবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ইহাতে বুদ্ধের মুখে পাটলিপুত্রের ভাবি উন্নতি বিষয়ের যে কথাগুলি দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে ইহার রচনাকাল, পাটলিপুত্র মগধ-রাজধানীরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার উত্তরকালে বলিয়া অনুমান হয়,—খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দী ধরা যাইতে পারে।

ধর্ম্মপদ।—

সুত্ত-পিটকের অন্তর্ভূত ক্ষুদ্রক নিকায়ের পঞ্চদশ গ্রন্থের একটী গ্রন্থ। ইহার নাম হইতেই বিষয়ের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে, ধর্ম্ম-নীতি বিষয়ক পদাবলী। ইহাতে যে সকল ধর্ম্ম-প্রবচন ও হিতোপদেশ আছে, আমাদের মহাভারত, গীতা, এবং অন্যান্য নীতিশাস্ত্রে তাহার অনুরূপ কথার অপ্রতুল নাই, কতক

বিষয়ে অবিকল সাদৃশ্যও উপলক্ষিত হয়—তথাপি ইহার কোন কোন ভাগে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষত্ব উপলব্ধি করা যায়, তাহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ইহার কতিপয় শ্লোক নিম্নে অনুবাদ করিয়া দিতেছি, তাহা হইতেই ইহার স্বরূপ ও মতামত কতকটা বুঝিতে পারিবেন।

এইখানে প্রথমে দুইটী শ্লোক বলিব, তাহা বুদ্ধদেব প্রবুদ্ধ হইবামাত্র উচ্চারণ করেন বলিয়া লোকের বিশ্বাস।

অনেক জাতি সংসারং সন্ধাবিস্সং অনিব্বিসং
গহকারকং গবেসন্তো দুঃখা জাতি পুনপ্পুনং।
গহকারক! দিট্‌ঠোঽসি, পুন গেহং ন কাহসি
সব্বা তে ফাসুকা ভগ্‌গা গহকূটং বিসংখিতং।
বিসঙ্খারগতং চিত্তং তণ্‌হানং খয়মজ্‌ঝগা।

অর্থ—জন্ম জন্মান্তর পথে ফিরিয়াছি, পাইনি সন্ধান,
সে কোথা গোপনে আছে, এ গৃহ যে করেছে নির্ম্মাণ;
পুনঃ পুনঃ দুঃখ পেয়ে দেখা তব পেয়েছি এবার—
হে গৃহকারক! গৃহ না পারিবি রচিবারে আর;
ভেঙ্গেছে তোমার স্তম্ভ, চুরমার গৃহভিত্তিচয়,
সংস্কারবিগত চিত্ত, তৃষ্ণা আজি পাইয়াছে ক্ষয়।

মনেতেই ধর্ম্ম। ১, ২

মনেতেই ধর্ম্ম; ধর্ম্ম মনোগামী। যে ব্যক্তি মন্দভাবে আলাপ ও কার্য্য করে, টানা গাড়ী যেমন বলদের পিছনে পিছনে যায় দুঃখ সেইরূপ তার অনুগামী হয়।

মনেতেই ধর্ম্ম; ধর্ম্ম মনোগামী। যিনি ভাল ভাবে আলাপ ও কার্য্য করেন, ছায়ার ন্যায় সুখ তাঁর অনুগামী হয়।

যে যা করে, সে তা হয়; উল্টে না কদাপি,
সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী।

(পদ্যে ব্রাহ্মধর্ম্ম)

পাপ পুণ্য। ১৭, ১৮

পাপকারী ইহলোক পরলোক উভয়ত্র দুঃখ ভোগ করে। ইহলোকে পাপাচরণ করিয়া সন্তাপ, পরলোকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইয়া আরো যন্ত্রণা।

পুণ্যবান ইহলোকে পরলোকে উভয়ত্র সুখ ভোগ করেন। ইহলোকে পুণ্য কর্ম্ম করিয়া আনন্দিত, পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হইয়া অধিকতর আনন্দ উপভোগ করেন।

পাপ করি পাপকীর্ত্তি দহে পাপানলে,
পুণ্য করি পুণ্যকীর্ত্তি বাড়ে পুণ্য ফলে।
পুণ্য আচরণে আত্মা হয় পুণ্যময়,
পাপ আচরণে হয় পাপের আলয়॥ ঐ

১২১। পাপ আসিবে না মনে করিয়া পাপ বর্জনে অবজ্ঞা করিবেক না: জলবিন্দুপাতে অল্পে অল্পে জলকুম্ভ পূর্ণ হয়, অল্পে অল্পে সঞ্চয় করিয়া মূর্খ পাপে পূর্ণ হয়।

ক্ষরিলে ইন্দ্রিয় কোনো, বুদ্ধিও ক্ষরিতে সুরু করে,
কলসের ছিদ্র দিয়া জল যথা ক্রমশঃ নিঃসরে। ঐ

১২২। পুণ্য আসিবে না মনে করিয়া পুণ্যার্জনে অবজ্ঞা করিবেক না। জলবিন্দুপাতে অল্পে অল্পে জলকুম্ভ পূর্ণ হয়, ধীর ব্যক্তি অল্পে অল্পে পুণ্য সঞ্চয় করিয়া পুণ্যে পূর্ণ হয়েন।

ক্ষুদ্রকীট পুত্তিকা বিরচে যথা প্রকাণ্ড আলয়,
অল্পে অল্পে তেমনি ধরম ধন করিবে সঞ্চয়। ঐ

১৬৫। মনুষ্য আপনিই পাপ করে, আপনিই তার ফল ভোগ করে। আপনি পাপ কর্ম্ম হইতে বিরত হয়, আপনিই শুদ্ধি লাভ করে। পাপ পুণ্য আমার নিজেরই জিনিস, আপনি ভিন্ন আর কেহ আমাকে পরিত্রাণ করিতে সক্ষম নহে।

একাই জনমে নর, একা হয় মৃত;
একাই সুকৃত ভুঞ্জে, একাই দুষ্কৃত। ঐ

২১৯-২২০

চির-প্রবাসী দূর হইতে নির্ব্বিঘ্নে প্রত্যাগত হইলে আত্মীয় স্বজন বন্ধু তাহাকে স্বাগত বলিয়া অভ্যর্থনা করে, সেইরূপ পুণ্যবান ব্যক্তি পুণ্য কর্ম্ম করিয়া ইহলোক হইতে অপসৃত হইলে পর তাঁহার পুণ্য তাঁহাকে বন্ধুর ন্যায় প্রতিগ্রহণ করেন।

চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং,
ঞাতি মিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং।
তথেব কত পুঞ্ঞম্পি অস্মা লোকা পরং গতং
পুঞ্ঞানি পতিগণ্হন্তি পিয়ং ঞাতীব আগতং।

(পালি)